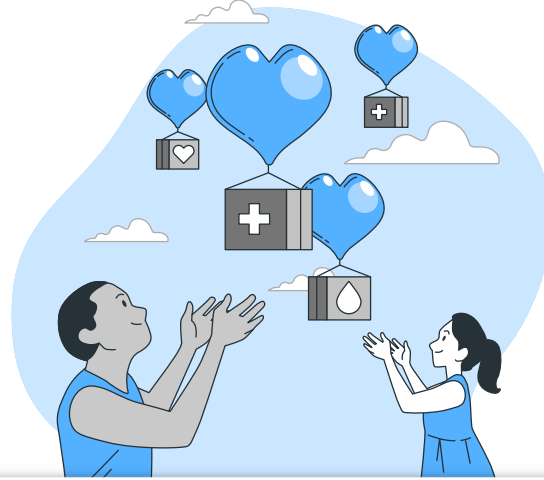


10 MINUTE
SCHOOL

বাংলা প্রথম পত্র

নবম-দশম শ্রেণি

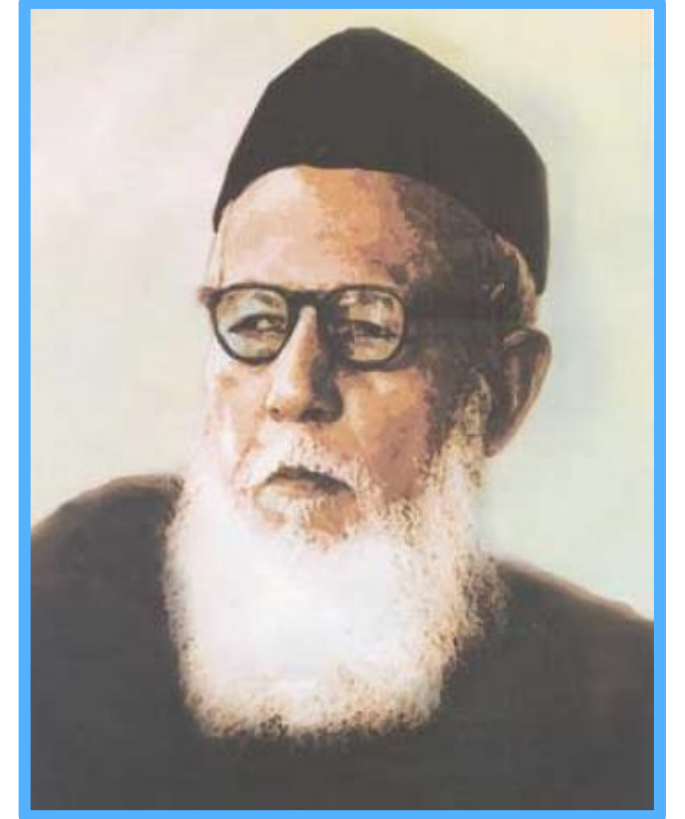


শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

লেখক-পরিচিতি

মোতাহের হোসেন চৌধুরী ১৯০৩ সালে কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৩ সালে বাংলায় এম.এ পাস করেন। কর্মজীবনে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। একজন সংস্কৃতিবান ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে তিনি খ্যাত ছিলেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'শিখা' পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর লেখায় মননশীলতা ও চিন্তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর গদ্যে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব লক্ষ্যণীয়। মূলত গদ্যকার হলেও তিনি বেশ কিছু কবিতাও রচনা করেন। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ সংস্কৃতি কথা বাংলা সাহিত্যের মননশীল প্রবন্ধ-ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাঁর মৃত্যুর পর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সভ্যতা ও সুখ তাঁর দুটি অনুবাদগ্রন্থ। ১৯৫৬ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।



শব্দার্থ ও টীকা

| শব্দার্থ | টীকা |
|---|------|
| নিগড়- শিকল, বেড়ি। | |
| তিমির- অন্ধকার। | |
| ক্ষুৎপিপাসা- ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। | |
| ফতুর- নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত। | |
| লেফাফাদুরন্তি- বাইরের দিক থেকে ক্রটিহীনতা কিন্তু ভিতরে প্রতারণা। | |
| বেড়ি- শিকল, শৃঙ্খল। | |
| হামেশা- সবসময়, সর্বক্ষণ। | |
| উন্মোচন-উন্মুক্ত করা। | |

শব্দার্থ ও টীকা

| শব্দার্থ | টীকা |
|--|--|
| পিঞ্জরবদ্ধ -খাঁচায় বন্দি। | |
| জীবসত্তা - জীবের অস্তিত্ব। | জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে হলে <u>অন্নবস্তু</u> চাই। |
| মানবসত্তা - মানুষের অস্তিত্ব। | মানবসত্তা বলতে লেখক <u>মনুষ্যত্বকে</u> বুঝিয়েছেন। শিক্ষার মাধ্যমে এই মনুষ্যত্ব <u>অর্জন</u> করা যায়। |
| অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি - লেখকের মতে আমরা জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে অধিক মনোযোগী। | ফলে অর্থচিন্তা আমাদের <u>সারাক্ষণ ব্যস্ত</u> রাখে। অর্থচিন্তায় ব্যস্ত মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব <u>অর্জনে সক্ষম</u> নয়। |
| কারারুদ্ধ আহরতৃপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু? - খাওয়া-পরার সমস্যা মিটে গেলেই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব হয় না। | এ জন্য প্রয়োজন চিন্তার স্বাধীনতা, <u>বুদ্ধির স্বাধীনতা</u> ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা। শিক্ষার মাধ্যমেই এ স্বাধীনতা অর্জিত হয়। |

পাঠ-পরিচিতি

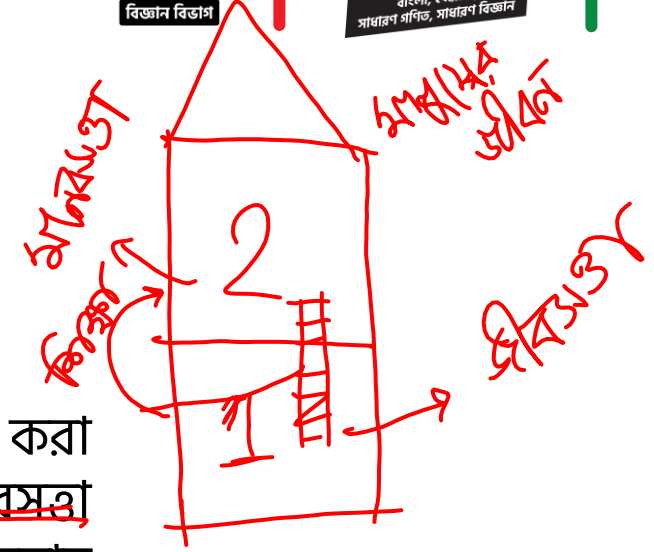
com 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' গ্রন্থের 'মনুষ্যত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধের অংশবিশেষ। মানুষের দুটি সত্তা একটি তার জীবসত্তা, অপরটি মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। জীবসত্তার প্রয়োজনে অনবস্থের চিন্তা থেকে মুক্তি এবং শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। শিক্ষার ফলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে অনবস্থের সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে ওঠে। শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি, জ্ঞান দান নয়; জ্ঞান মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায়মাত্র।



শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব ওপরের তলা। জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীবসত্তার ঘরেও সে কাজ করে, ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলাই, তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য কথায়, শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনীয় দিকও আছে। আর অপ্রয়োজনের দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক। সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কী করে মনোমালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আন্বাদন করা যায়।



শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

শিক্ষার এ দিকটা যে বড় হয়ে ওঠে না, তার কারণ ভুল শিক্ষা ও নিচের তলায় বিশৃঙ্খল জীবনসত্তার ঘরটি এমন বিশৃঙ্খল হয়ে আছে যে, হতভাগ্য মানুষকে সব সময়ই সে সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। ওপরের তলার কথা সে মনেই আনতে পারে না। অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি। ধনী-দরিদ্র সকলেরই অন্তরে সেই একই ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে : চাই, চাই, আরও চাই। তাই অর্থচিন্তা তথা অর্থচিন্তা থেকে মানুষ মুক্তি না পেলে, অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়- একথা মানুষকে ভালো করে বোঝাতে না পারলে মানবজীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারবে না। ফলে শিক্ষার সুফল হবে ব্যক্তিগত, এখানে সেখানে দুএকটি মানুষ শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যটি উপলব্ধি করতে পারবে, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে যাবে।



শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

শিক্ষা

তাই অনচিন্তার নিগড় থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার যে চেষ্টা চলেছে তা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু লক্ষ্য সঙ্ঘর্ষে সচেতন না থাকলে সে চেষ্টাও মানুষকে বেশি দূর নিয়ে যেতে পারবে বলে মনে হয় না। কারারুদ্ধ আহারতৃপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু? প্রচুর অনবস্থ পেলো আলো হাওয়ার স্বাদবঞ্চিত মানুষ কারাগারকেই স্বর্গতুল্য মনে করে। কিন্তু তাই বলে যে তা সত্যসত্যই স্বর্গ হয়ে যাবে, তা নয়। বাইরের আলো হাওয়ার স্বাদ পাওয়া মানুষ প্রচুর অনবস্থ পেলোও কারাগারকে কারাগারই মনে করবে, এবং কী করে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তাই হবে তার একমাত্র চিন্তা। আকাশ-বাতাসের ডাকে, যে পক্ষী আকুল, সে কি খাচায় বন্দি হবে সহজে দানাপানি পাওয়ার লোভে? অনবস্থের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়, এই বোধটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।



শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা
যেখানে নেই সেখানে মুক্তি নেই। মানুষের অনবস্থের সমস্যা
সমাধানের চেষ্টা করতে হবে এই মুক্তির দিকে লক্ষ রেখে।
ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মানুষটিকে তৃপ্ত রাখতে না পারলে
আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না বলেই ক্ষুৎপিপাসার
তৃপ্তির প্রয়োজন। একটা বড় লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই
অনবস্থের সমাধান করা ভালো, নইলে আমাদের বেশি দূর
নিয়ে যাবে না।



শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

১) জীবন
২) শিক্ষা

২ তাই মুক্তির জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। একটি
অনবস্থের চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা,
আরেকটি শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা মানুষকে মনুষ্যত্বের স্বাদ
পাওয়ানোর সাধনা। এ উভয়বিধ চেষ্টার ফলেই মানবজীবনের
উন্নয়ন সম্ভব। শুধু অনবস্থের সমস্যাকে বড় করে তুললে
সুফল পাওয়া যাবে না। আবার শুধু শিক্ষার ওপর নির্ভর
করলে সুদীর্ঘ সময়ের দরকার। মনুষ্যত্বের স্বাদ না পেলে
অনবস্থের চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়েও মানুষ যেখানে আছে
সেখানেই পড়ে থাকতে পারে; আবার শিক্ষাদীক্ষার মারফতে
মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলেও অনবস্থের দুশ্চিন্তায় মনুষ্যত্রে সাধনা
ব্যর্থ হওয়া অসম্ভব নয়।



শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

কোনো ভারি জিনিসকে ওপরে তুলতে হলে তাকে নিচের থেকে ঠেলতে হয়, আবার ওপর থেকে টানতেও হয়; শুধু নিচের থেকে ঠেললে তাকে আশানুরূপ ওপরে ওঠানো যায় না। মানব উন্নয়নের ব্যাপারে শিক্ষা সেই ওপর থেকে টানা, আর সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা নিচের থেকে ঠেলা। অনেকে মিলে খুব জোরে ওপরের থেকে টানলে নিচের ঠেলা ছাড়াও কোনো জিনিস ওপরে ওঠানো যায়- কিন্তু শুধু নিচের ঠেলায় বেশিদূর ওঠানো যায় না। তেমনি আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষার দ্বারাই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব, কিন্তু শুধু সমাজ ব্যবস্থার সুশৃঙ্খলতার দ্বারা তা সম্ভব নয়।



শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

শিক্ষাদীক্ষার ফলে সত্যিকার মনুষ্যত্বের ফলে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, “লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু” কথাটা বুলিমান্ব, সত্য। লোভের ফলে যে মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটে, অনুভূতির জগতে সে ফতুর হয়ে পড়ে, শিক্ষা মানুষকে সে-কথা জানিয়ে দেয় বলে মানুষ লোভের ফাঁদে ধরা দিতে ভয় পায়। ছোট জিনিসের মোহে বড় জিনিস হারাতে যে দুঃখ বোধ করে না, সে আর যাই হোক, শিক্ষিত নয়। শিক্ষা তার বাইরের ব্যাপার, অন্তরের ব্যাপার হয়ে ওঠে নি। লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়। শিক্ষার আসল কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয়, মূল্যবোধ সৃষ্টি; জ্ঞান পরিবেশন মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় হিসেবেই আসে। তাই যেখানে মূল্যবোধের মূল্য পাওয়া হয় না, সেখানে শিক্ষা নেই।



শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ তথা মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়;
তথাপি অনবস্থের সুব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়। তা না হলে
জীবনের উন্নয়নে অনেক বিলম্ব ঘটবে। মনুষ্যত্বের তাগিদে
মানুষকে উন্নত করে তোলার চেষ্টা ভালো; কিন্তু প্রাণিত্বের
বাধন থেকে মুক্তি না পেলে মনুষ্যত্বের আত্মন মানুষের মর্মে
গিয়ে পৌঁছতে দেরি হয় বলে অনবস্থের সমস্যার সমাধান
একান্ত প্রয়োজন।



শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

পায়ের কাটার দিকে বারবার নজর দিতে হলে হাটার আনন্দ উপভোগ করা যায় না, তেমনি অন্নবস্ত্রের চিন্তায় হামেশা বিব্রত হতে হলে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই দু দিক থেকেই কাজ চলা দরকার। একদিকে অন্নবস্ত্রের চিন্তার বেড়ি উন্মোচন, অপরদিকে মনুষ্যত্বের আত্মান, উভয়ই প্রয়োজনীয়। নইলে বেড়ি মুক্ত হয়েও মানুষ ওপরে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করবে না, অথবা মনুষ্যত্বের আত্মান সত্তেও ওপরে যাওয়ার স্বাধীনতার অভাব বোধ করবে, পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো উড়বার আকাঙ্ক্ষায় পাখা ঝাপটাবে, কিন্তু উড়তে পারবে না।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ১/৩/৫/৭
২. ২/৪/৬/৮

১। মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে কোন দিকে লক্ষ রেখে?

- ক. অর্থনৈতিক মুক্তির
গ. চিন্তার স্বাধীনতা

- খ. আত্মিক মুক্তির
ঘ. বুদ্ধির স্বাধীনতা

২। আত্মিক মৃত্যু বলতে লেখক কি বুঝিয়েছেন?

- i. স্বাভাবিক মৃত্যু —X
ii. নৈতিক অধঃপতন
iii. মূল্যবোধের অবক্ষয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
গ. i ও iii

- খ. ii ও iii

- ঘ. i, ii ও iii



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শুকুর মিয়া তার স্কুল-পড়ুয়া ছেলেকে ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত করেন। তিনি মনে করেন টাকাই জীবনের মূল। দুনিয়াতে যার যত টাকা সে তত বেশি সুখী।

৩। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে উদ্দীপকের শুকুর মিয়ার মাঝে প্রাধান্য পেয়েছে-

- i. ক্ষুণ্ণপিপাসা
- ii. আত্মার অমৃত
- iii. অর্থলিলা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

✓ গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

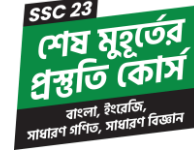
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শুকুর মিয়া তার স্কুল-পড়ুয়া ছেলেকে ব্যবসায়ের আজো নিয়োজিত করেন।
তিনি মনে করেন টাকাই জীবনের মূল। দুনিয়াতে যার যত টাকা সে তত বেশি সুখী।

৪। শুকুর মিয়ার মানসিকতা পরিবর্তন হতে পারে যদি তিনি-

- ✓ ক. অর্থলিপ্সাকে জীবন-সাধনা মনে না করেন
- খ. শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিককে গুরুত্ব দেন ✗
- গ. অর্থচিন্তার নিগড়ে সর্বদা বন্দি থাকেন
- ঘ. অনবস্থের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তিকে বড় করে না দেখেন।



সৃজনশীল প্রশ্ন



উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুমন ও শ্যামল বাল্যবন্ধু। দুজনই উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত। পেশাগত জীবনে সুমন বড় ব্যবসায়ী। গাড়ি, বাড়ি, টাকা-কড়ি কোনো কিছুই অভাব নেই তার। সবাই তাকে এক নামে চেনে। আর শ্যামল শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়। গত সিডরে তাদের গ্রাম লন্ডভন্ড হয়ে যায়। এ সময় শ্যামলতার ছাত্রদের নিয়ে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে অসহায় মানুষদের কাছে পৌঁছে দেয়। তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে। অথচ সুমন ছুটে এসে সাহায্যের বদলে অসহায় মানুষদের কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে বিঘার পর বিঘা জমি কিনে নেয়।

ক. মানব জীবনে মুক্তির জন্য মোতাহের হোসেন চৌধুরী কয়টি উপায়ের কথা বলেছেন?

খ. আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না কেন?

গ. উদ্দীপকের সুমনের মাঝে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রকাশিত তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'শ্যামলের কাজে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি উপস্থিত'-'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

10 MINUTE
SCHOOL

বাংলা প্রথম পত্র
নবম-দশম শ্রেণি

তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা

শামসুর রহমান
রহমান

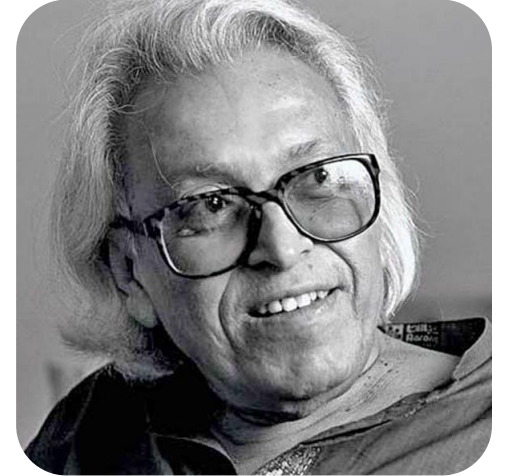


তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা

শামসুর রহমান

কবি-পরিচিতি:

শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৪শে অক্টোবর ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন।
তঁার পিতা মোখলেসুর রহমান চৌধুরী ও মাতা আমেনা খাতুন। বিশেষ করে
মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের প্রত্যাশা, হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, বৈরাগ্য ও ~~সমগ্র~~ ^{অংশ}
তঁার কবিতায় সার্থকভাবে বিধৃত।



তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা

শামসুর রহমান

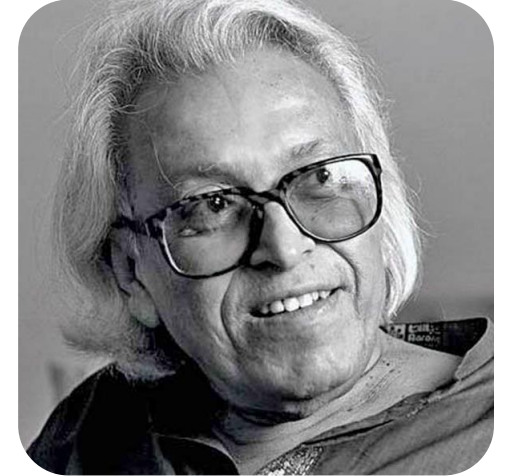
Writen

কবি-পরিচিতি:

তঁার প্রধান কাব্যগ্রন্থ :

প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিরালোকে
দিব্যরথ, নিজ বাসভূমে, বন্দী শিবির থেকে, দুঃসময়ের মুখোমুখি, ফিরিয়ে
নাও ঘাতক কাঁটা, এক ধরনের অহংকার, আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি, আমি
অনাহারী, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে, বুক তার
বাংলাদেশের হৃদয়, গৃহযুদ্ধের আগে, হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো, হরিণের
হাড়, মানব হৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই ইত্যাদি।

তিনি ১৭ই আগস্ট, ২০০৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।



শব্দার্থ ও টীকা :

সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর- হরিদাসী বিধবা হলো। সনাতন ধর্মের মেয়েদের বিয়ের পর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হয়। তার স্বামী মারা গেলে সেই সিঁদুর মুছে ফেলা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের দেশের এমন অনেক হরিদাসীর স্বামী মুক্তিযুদ্ধ করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন। হরিদাসীর স্বামীও শহিদ হয়েছেন। এ বিষয়টি বুঝানোর জন্য বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে;

যত্রতত্র - যেখানে সেখানে, সব জায়গায়;

তুমি আসবে বলে ... ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো - স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালিদের ওপর বীভৎস ও ভয়ংকর আক্রমণ চালায়। তারা গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে দেয়। তাদের সেই আক্রমণ থেকে ছাত্রদের ছাত্রাবাস, গরিব মানুষের থাকার জায়গা, বস্তিও রক্ষা পায়নি। পাকিস্তানি সেনারা ছাত্রাবাস ও বস্তিতেও আক্রমণ করে, এবং সেখানকার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে এবং পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়;



পুখুড়ে এক বুড়ো - বয়সের ভারে বিধ্বস্ত লোক, যার বয়স অনেক হয়েছে। এবং চলাচল করতে যার কষ্ট হয়;

রুস্তম শেখ এখন পোকার দখলে- রুস্তম শেখ নামের এক রিকশাওয়ালা যিনি যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। মৃত অবস্থা বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে যার ফুসফুস এখন পোকার দখলে।



পাঠ-পরিচিতি:

‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা’ শীর্ষক কবিতাটি শামসুর রাহমানের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। কবিতাটি করি বন্দী শিবির থেকে নামক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সগ্রামে স কিনা বিবির মতো গ্রামীণ নারীর সহায়-সম্বল-সম্মম বিসর্জিত হয়েছে, হরিদাসী হয়েছে স্বামীহারা, নবজাতক হারিয়েছে মা-বাবাকে।

সেইসঙ্গে নবীন রক্তে প্রাণস্পন্দন ও আশা জেগে থাকতে দেখে কবি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেন- এত আত্মত্যাগ যার উদ্দেশ্যে সেই স্বাধীনতাকে বাঙালি একদিন ছিনিয়ে আনবেই।



তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা

শামসুর রহমান

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?

তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীরা।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে



কিছু নেই / কতবার হাজার হাজার

শহীদদের তথ্য

ইতিহাসে
অনেক যুদ্ধ/মুহুর

সামরিক
বাহিনী
দেখতে
উদ্ভাবিত

তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটাল যত্রতত্র।

তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্থূপে দাঁড়িয়ে একটানা আত্ননাদ করল একটা কুকুর।

তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতা-মাতার লাশের উপর।
তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে

আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?

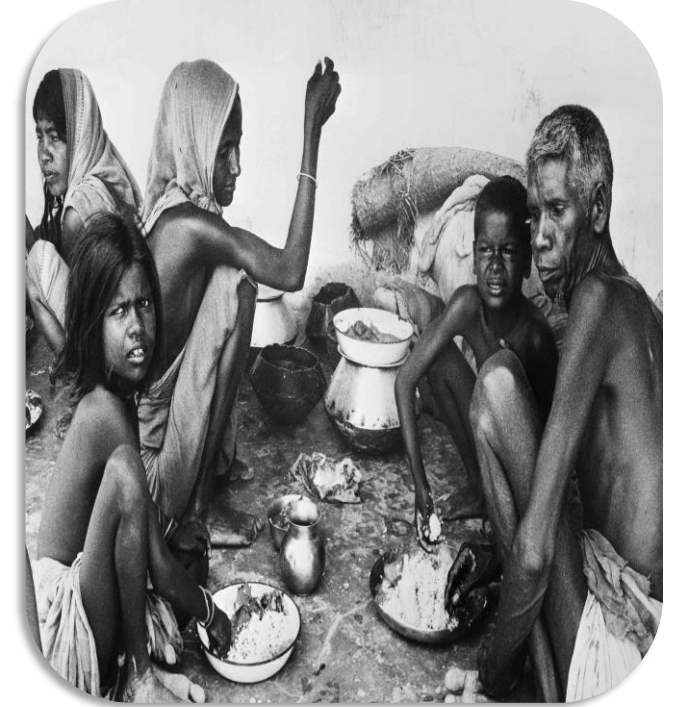
আর কতবার দেখতে হবে থাণ্ডবদাহন?

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে থুথুড়ে এক বুড়ো
উদাস দাওয়ায় বসে আছেন- তাঁর চোখের নিচে অপরাহ্নের
দুর্বল আলোর ঝিলিক, বাতাসে নড়ছে চুল।



স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
মোল্লাবাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছেন
নড়বড়ে খুঁটি ধরে দগ্ধ ঘরের।
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে
বসে আছে পথের ধারে।

তোমার জন্যে,
সগীর আলী শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,
কেষ্ট দাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা,
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি,
গাজী গাজী বলে যে নৌকা চালায় উদ্দাম ঝড়ে,
রুস্তম শেখ ঢাকার রিকশাওয়ালা, যার ফুসফুস
এখন পোকের দখলে



আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো
সেই তেজি তরুণ যার পদভারে
একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হতে চলেছে –
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।

– পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাংলায়
তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।



বিগত বছরের এস.এস.সি পরীক্ষায় আসা জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

- অবুঝ শিশু কোথায় হামাগুড়ি দিল? [য. বো. '২০]
- ✓ থুথুড়ে বুড়োর চোখের নিচে কী ছিল? [ব. বো. '২০]
- শামসুর রাহমানের কবিতায় সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে কী? [চ. বো. '১৯]
- জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক কীভাবে এলো? [দি. বো. '১৯]
- অধীর আগ্রহে সবাই বসে আছে কিসের প্রতীক্ষায়? [চ. বো. '১৭]
- জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোক কে? [সি. বো. '১৭]
- দানবের মতো চিৎকার করতে করতে কী এসেছিল? [ব. বো. '১৭]
- কার সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল? [ব. বো. '১৭]
- কার ফুসফুস এখন পোকের দখলে? [রা. বো. '১৭]

বিগত বছরের এস.এস.সি পরীক্ষায় আসা জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

- 'তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা' – কবির এই দৃঢ় উত্তির কারণ বুঝিয়ে লেখ। [য. বো. '২০]
- 'সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল।" এ কথার মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে ? [ব. বো. '২০]
- ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো কেন? [দি. বো, '৯৯. সি. বো, '৯৭]

সৃজনশীল প্রশ্ন

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই শাসকগোষ্ঠী শুরু করে নানা বৈষম্যনীতি। তারা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু এদেশের ছাত্র শিক্ষকসহ আপামর জনতা এর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, বিসর্জন দেয় বুকের তাজা রক্ত।

ক. কার সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল?

খ. জলপাই রঙের ট্যাঙ্কে কবি দানব বলেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকের যে ভাবটি তোমাকে পাওয়ার জন্যে, 'হে স্বাধীনতা' কবিতায় পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় বর্ণিত দিকগুলোর একটিমাত্র দিক উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে। মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কার সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল?

- হরিদাসীর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল।

খ. জলপাই রঙের ট্যাঙ্কে কবি দানব বলেছেন কেন?

- জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক কামানের গোলার তীব্র শব্দ নিয়ে শহরে প্রবেশ করেছিল বলে কবি সেটাকে দানব বলেছেন।
- "তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা" কবিতায় বর্বর পাকিস্তানি যুদ্ধবাজদের নির্মমতার চির প্রতিফলিত হয়েছে। তারা বাঙালিদের রূপের নির্মম অত্যাচার চালায়। ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ সাধারণ মানুষকে অকাতরে হত্যা করে। জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক রাস্তায় নেমে আসে। ট্যাঙ্কের কামানের গোলায় ছাত্রাবাস, বস্তি সব ধ্বংস করে দেয়। রূপকথার দানবের মতো চিৎকার করতে করতে সেই ট্যাঙ্কগুলো ছুটে বেড়ায় শহরময়। এ প্রসঙ্গেই কবি জলপাই রঙের ট্যাঙ্কে দানব বলেছেন।

গ. উদ্দীপকের যে ভাবটি তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর।

- উদ্দীপকের যে ভাবটি “তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা” কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো- পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন-সংগ্রাম।
- যুগে যুগে ভিনদেশি, বিভাষী, বিজাতীয়রা এদেশে এসে নানা রকম শোষণ-অত্যাচার চালিয়েছে। এদেশের মাটির সোনার ফসলই তাদেরকে এখানে টেনে এনেছে। তারা যথাসময়ে লোভ-লালসা চরিতার্থ তথা এদেশের সম্পদ আহরণ করে আবার ফিরে গেছে। প্রতিবারই এদেশের উত্তরাধিকারীদের ভাগ্যে লেপন করে গেছে দুর্ভাগ্যের কালিমা।

- উদ্দীপকে পাকিস্তানি শাসকদের বাংলা ভাষার ওপর নিরলঙ্ঘ্য হস্তক্ষেপের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। সেদিন এদেশের ছাত্র-জনতা বর্বর পাকিস্তানি পুলিশের গুলিতে বুকের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছেন। উদ্দীপকের এই ঐক্যবদ্ধ শক্তির ভাবটি আলোচ্য কবিতার ভাবের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কবিতায় 'স্বাধীনতা' অর্জনে আপামর বাঙালি নারী-পুরুষের সংগ্রামী চেতনা এবং তাঁদের মহান আত্যাগের মহিমা তুলে ধরা হয়েছে। কবিতায় বর্বর পাকিস্তানি যুদ্ধবাজদের নির্মম অত্যাচার, হত্যা, ধর্ষণ, ধ্বংসলীলা উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষ মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন করেছেন। তাই উদ্দীপকের ভাষার জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী চেতনার ভাব এবং 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় স্বাধীনতাকে পাওয়ার জন্য বাঙালির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী চেতনার তার এক ও অভিন্ন।

ঘ. 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় বর্ণিত দিকগুলোর একটিমাত্র দিক উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে। মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

- 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় বর্ণিত দিকগুলোর একটিমাত্র দিক উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।- মন্তব্যটি যথার্থ।
- স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। সেই অধিকার অর্জন করতে হলে মানুষকে অনেক ত্যাগ ও সংগ্রাম করতে হয়। সংগ্রাম ছাড়া স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে দেশের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকতে হয়।
- উদ্দীপকে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় বর্ণিত আত্মত্যাগের দিকটি ফুটে উঠেছে।

- রাষ্ট্রভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দু চাপিয়ে দেওয়াকে এদেশের আপামর জনতা মেনে নেয়নি, ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অবশেষে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছো। উদ্দীপকের এই বিষয়টি ছাড়াও কবিতায় যুদ্ধবাজ পাকিস্তানি সেনাদের নির্মম অত্যাচার, অমানবিক নির্যাতন, বিনা কারণে রাতের আঁধারে নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ এবং ছাত্রাবাস, বস্তি, মানুষের ঘরবাড়ি সব ধ্বংস করে দেওয়া ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।
- ‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা কবিতায় স্বাধীনতা অর্জনে আপামর বাঙালি নারী-পুরুষের সংগ্রামী চেতনা এবং তাদের মহান আত্মত্যাগের মহিমাকে তুলে ধরা হয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালিদের ওপর নির্মম গণহত্যা চালিয়েছে এবং তাদেরকে স্বাধীনতা অর্জনের সমস্ত স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দিতে চেয়েছে। এ বিষয়টি উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি। এছাড়া স্বাধীনতার জন্য অপেক্ষায় থাকার মতো কোনো বিষয়ও সেখানে নেই। এসব দিক বিবেচনায় বলা যায়, কবিতায় বর্ণিত দিকগুলোর একটি দিক উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।



বাংলা প্রথম পত্র (সহপাঠ)

নবম-দশম শ্রেণি

কাকতাদুয়া

সেলিনা হোসেন



কাকতাদুয়া

সেলিনা হোসেন

ক. উপন্যাসের ধারণা ও সংজ্ঞা

উপন্যাস গদ্যে লেখা একধরনের গল্প।

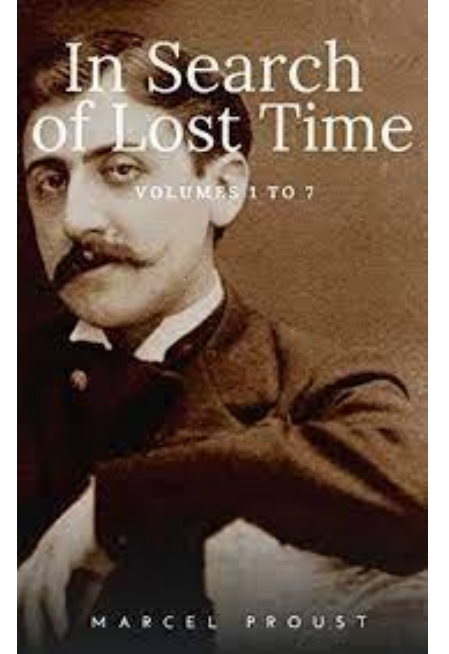
পনেরো শতকে ছাপাখানার আবির্ভাবের পর বিলুপ্তি ঘটে গল্পকথকদের। শুরু হয় আধুনিক উপন্যাসের কাল। প্রথমে এই আধুনিক উপন্যাসের সূত্রপাত ঘটে ইউরোপে, পরে তা ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে।

উপন্যাসের আকার সাধারণত ছোট হয় না, আবার এটি নিতান্ত ছোট গল্পও নয়।



ই. এম. ফস্টার তার আসপেক্ট্‌স্ অব দ্য নভেল গ্রন্থে বলেছেন, উপন্যাস হচ্ছে সুনির্দিষ্ট আয়তনের গদ্যকাহিনী’ (prose of a certain extent)। এই আয়তনের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, উপন্যাসের শব্দসংখ্যা কমপক্ষে পঁচিশ হাজার হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে এর সর্বোচ্চ সংখ্যা কত হবে, ফস্টার সে সম্পর্কে কিছু বলেননি।

প্রখ্যাত ফরাসি ঔপন্যাসিক মার্সেল প্রুস্তের লেখা একটি উপন্যাসের (In Search of Lost Time) শব্দসংখ্যা বারো লাখের মতো। এটিই এ পর্যন্ত লেখা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উপন্যাস। লেভ তলস্তয়ের ওয়ার অ্যান্ড পিসের শব্দসংখ্যাও অনেক – পাঁচ লাখ সাতাশ হাজারের মতো। ইতালির বিখ্যাত নন্দনতাত্ত্বিক ও ঔপন্যাসিক উমবার্তো একো আবার সাত শব্দের এক বাক্যে রচিত একটি লেখাকে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম উপন্যাস বলে দাবি করেছেন।



বাংলায় ব্যবহৃত এই শব্দটির সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি হচ্ছে এ রকম : উপ+নি+অস+অ = উপন্যাস। ইংরেজিতে এর দুটি প্রতিশব্দ আছে : Novel Fiction। নভেল শব্দটি এসেছে ইতালির novella থেকে। এর অর্থ : ale (গল্প) বা কাহিনী। ফিকশনের উৎস হচ্ছে fact (ঘটনা) বা গল্প।

উপন্যাসের কয়েকটি সংজ্ঞা

সাহিত্যের বিশেষ রূপ হিসেবে উপন্যাসের সংজ্ঞা দেওয়া খুব সহজ নয়।

উপন্যাসের যেসব সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেগুলো এ রকম:

গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন ও জীবনানুভূতি কোনো বাস্তব কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয়, তাহাকে উপন্যাস কহে।

[উপন্যাস, সাহিত্য-সন্দর্শন, শ্রীশচন্দ্র দাস, কথাকলি, ঢাকা, ১৯৭৬।]

ইংরেজিতে 'নভেল' এক বিশেষ ধরনের সাহিত্য-সংরূপ। গদ্যে লেখা সুদীর্ঘ বর্ণনাত্মক সাহিত্যকর্ম।

[উপন্যাস, সাহিত্য শব্দার্থকোষ, সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ২৪।]

সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, উপন্যাস হচ্ছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সৃষ্টি। সাহিত্যের আদিরূপ হিসেবে প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল কবিতা, মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য।

সতেরো শতকের হিস্পানি ঔপন্যাসিক সার্ভেস্তাসের ডন কিহোততা থেকে আধুনিক কালের এই বোধেই পৌঁছেছেন ঔপন্যাসিকেরা।

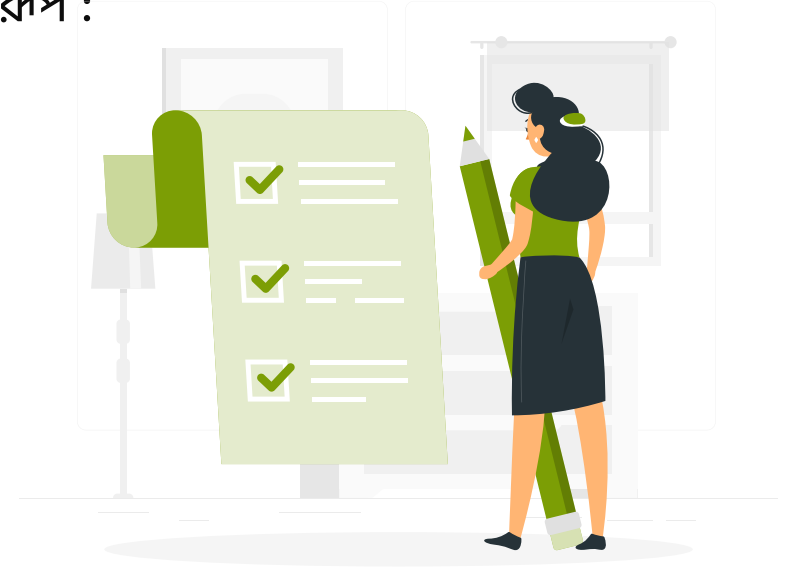
০৩৭

খ. উপন্যাসের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল

১৫

উপন্যাসের কাহিনী কীভাবে গড়ে তোলা হবে, সেটাই হচ্ছে উপন্যাসের আঙ্গিক ও গঠনকৌশলের দিক। প্রায় চার শ বছর ধরে নানা চর্চার মধ্য দিয়ে সাধারণভাবে উপন্যাস যেসব উপাদানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে সেগুলো নিম্নরূপ :

- ১ কাহিনী বা আখ্যানভাগ (plot)
- ২ চরিত্র (character)
- ৩ দৃশ্য/পরিবেশ (scene or setting)
- ৪ বর্ণনাভঙ্গি (narrative method)
- ৫ ভাষা (diction)
- ৬ ঔপন্যাসিকের জীবনভাবনা (Author's philosophy)।



উপন্যাসের প্রধান উপাদান এর কাহিনী বা গল্প। নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাসে দেখা যায়, গল্পের প্রাধান্য তেমন থাকে না। ভাষা বা বলার ভঙ্গিটাই প্রধান হয়ে ওঠে। অ্যাবসার্ড উপন্যাস কিংবা ফরাসি নব্য (nouveau) উপন্যাস এভাবেই লেখা হয়েছে। কতগুলো ছোট ছোট বা উপকাহিনীর সাহায্যে উপন্যাসের কাহিনী গড়ে তোলা হয়। উপন্যাসে উপস্থাপিত এই কাহিনীকে বলা হয় আখ্যানভাগ (plot) বা কাহিনী-সমগ্র।

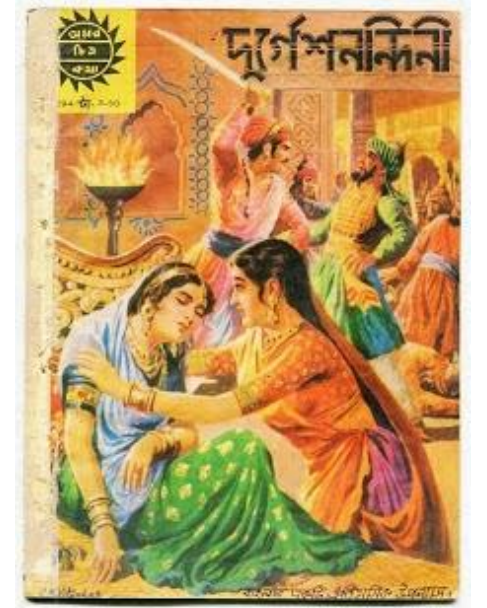
উপন্যাসের দ্বিতীয় উপাদান চরিত্র। চরিত্রের বিকাশের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনীও বিকশিত হয়।

উপন্যাসের আরেকটি উপাদান হচ্ছে এর নানান দৃশ্য বা পরিবেশ। বর্ণনারীতি হচ্ছে উপন্যাসের আরেকটি উপাদান। তবে উপন্যাসের সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে লেখকের জীবনভাবনা বা জীবনদর্শন। লেখকের বলা কথাটিই হচ্ছে তাঁর জীবনদর্শন। শেষ পর্যন্ত আমরা একটি উপন্যাসের কাহিনীতে এই জীবনদর্শনই প্রতিফলিত হতে দেখি।

গ. বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

উপন্যাস আধুনিক কালের সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে মাত্র দেড় শ বছর আগে ইংরেজি উপন্যাসের আদলে উপন্যাস রচনার সূত্রপাত ঘটে। তবে অনেকেই এর বীজ খুঁজে পেয়েছেন প্রাচীন সংস্কৃত কাহিনী-কাব্য, পঞ্চতন্ত্র ও বৌদ্ধ জাতকের গল্প, মধ্যযুগের রূপকথা, ময়মনসিংহ গীতিকা, রোমান্টিক কাহিনী-কাব্য, নাথ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, আরব্য উপন্যাস, লোকগাথা প্রভৃতি।

অনেকে মনে করেন, হ্যানা ক্যাথারিন মলেমের (১৮৬২-৬৯) লেখা ফুলমনি ও করুণার বিবরণ (১৯৫২) হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। কেউ কেউ আবার প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল-এর মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন। তবে সবাই মেনে নিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) দুর্গেশ নন্দিনী (১৮৬৫) হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা। তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হচ্ছে কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল ইত্যাদি।



তাঁর লেখা বহুল আলোচিত উপন্যাসগুলো হচ্ছে চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, চার অধ্যায় ও যোগাযোগ। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হচ্ছে চরিত্রহীন, গৃহদাহ, দেবদাস, দেনা-পাওনা, শ্রীকান্ত ইত্যাদি।

বাংলা উপন্যাসের জগতে এরপর আবির্ভাব ঘটে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হচ্ছে- গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, ধাত্রীদেবতা, হাসুলী বাঁকের উপকথা, কবি প্রভৃতি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : (১) মার্কসবাদের পটভূমিতে ধনী-দরিদ্রের দ্বন্দ্ব এবং (২) ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে নর-নারীর জটিল সম্পর্ককে তিনি উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা, চিরু শহরতলী প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। বাংলা উপন্যাস আরও যারা লিখে খ্যাতিমান হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন : জগদীশ গুপ্ত, সতীনাথ ভাদুড়ী, কমলকুমার মজুমদার, দেবেশ রায়, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

ঘ. বাংলাদেশের উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

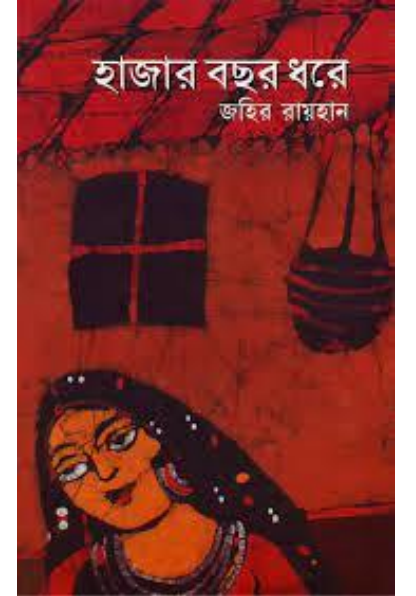
১৯৪৭ সালে রাজনৈতিকভাবে ভারত বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব বাংলায় সূচনা ঘটে নতুন এক সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার। এই সময়েই যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশের উপন্যাসের। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই অঞ্চলটি ছিল পাকিস্তানের উপনিবেশ। ঢাকাকে কেন্দ্র করে নাগরিক জীবনের আবির্ভাব ঘটলেও গ্রামীণ জীবন ছিল একই রকম।

ধনী-দরিদ্রের দ্বন্দ্ব, গ্রামীণ কুসংস্কার, দারিদ্র্য ইত্যাদির দ্বারা বিপর্যয় হয়ে পড়েছিল মানুষের জীবন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ অর্জন করে স্বাধীনতা। জাতীয় জীবনে দেখা দেয় নতুন উদ্দীপনা। জনজীবনে আধুনিকতার ছোঁয়া যেমন লাগে, তেমনি গ্রামীণ জীবনের টানও ছিল সমান। এই পটভূমিতে বাংলাদেশের উপন্যাসিকেরা লিখেছেন নানা ধরনের উপন্যাস। শ্রেণিকরণ করলে বাংলাদেশের উপন্যাসকে এভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে :

(১) গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত উপন্যাস : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লালসালু, কাঁদো নদী কাঁদো, চাঁদের অমাবস্যা, আবু ইসহাকের সূর্য-দীঘল বাড়ি, জহির রায়হানের হাজার বছর ধরে, আবদুল গাফফার চৌধুরীর চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান, শওকত ওসমানের জননী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামা, হাসান আজিজুল হকের আগুনপাখি, সৈয়দ শামসুল হকের মহাশূন্যে পুরান মাস্টার, সেলিনা হোসেনের দীপাশ্বিতা ইত্যাদি।

(২) নগর ও গ্রামের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস : আলাউদ্দিন আল আজাদের ক্ষুধা ও আশা, শহীদুল্লাহ কায়সারের সংশপ্তক, সরদার জয়েন উদ্দিনের অনেক সূর্যের আশা, আবুল ফজলের রাঙাপ্রভাত, আনোয়ার পাশার নীড় সন্ধানী ইত্যাদি।

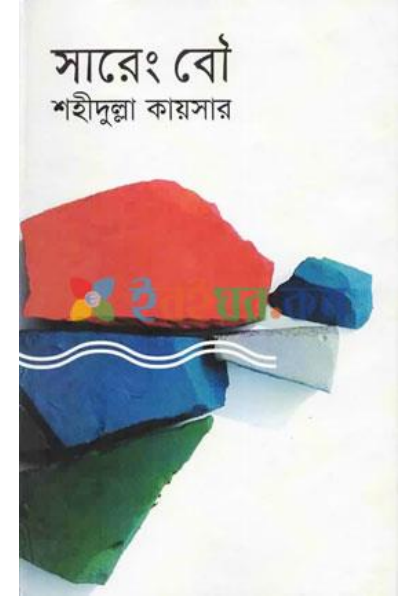
(৩) নগর জীবনের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস : আবুল ফজলের জীবন পথের যাত্রী, রশীদ করীমের উত্তম পুরুষ ও প্রেম একটি লাল গোলাপ, আবু রুশদের সামনে নতুন দিন, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই, শওকত আলীর দক্ষিণায়নের দিন ইত্যাদি।



(৪) আঞ্চলিক ও বিশেষ জীবনধারার উপন্যাস : আলাউদ্দিন আল আজাদের কর্ণফুলি, শহীদুল্লাহ কায়সারের সারেং বউ, শামসুদ্দীন আবুল কালামের কাশবনের কন্যা, আবু ইসহাকের পদ্মার পলি সরদার জয়েনউদ্দিনের পান্নামতি, শওকত আলীর প্রদোষে প্রাকৃতজন, সেলিনা হোসেনের পোকামাকড়ের ঘরবসতি ইত্যাদি।

(৫) মনস্তত্ত্ব ও দার্শনিক উপন্যাস : আলাউদ্দিন আল আজাদের তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, সৈয়দ শামসুল হকের দেয়ালের দেশও এক মহিলার ছবি, শওকত আলীর পিঙ্গল আকাশ, মাহমুদুল হকের খেলাঘর ইত্যাদি।

(৬) ঐতিহাসিক ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস : আবু জাফর শামসুদ্দিনের ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান ও পদ্মা মেঘনা যমুনা, শামসুদ্দীন আবুল কালামের আলম গড়ের উপকথা, সত্যেন সেনের অভিশপ্ত নগরী, আনোয়ার পাশার রাইফেল রোটি আওরাত, শওকত ওসমানের জলাঙ্গী, রিজিয়া রহমানের বং থেকে বাংলা, মাহমুদুল হকের জীবন আমার বোন, হাসান আজিজুল হকের বিধবাদের কথা, সেলিনা হোসেনের হাঙর নদী গ্রেনেড ও গায়ত্রী সন্ধ্যা ইত্যাদি।



এই বিভাজন ছাড়াও বয়সভেদে নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনা করেছেন বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকেরা। ফলে তাঁরা যেমন বড়দের জন্য উপন্যাস লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন ছোটদের জন্যও।

এই বিভাজন ছাড়াও বয়সভেদে নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনা করেছেন বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকেরা। ফলে তাঁরা যেমন বড়দের জন্য উপন্যাস লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন ছোটদের জন্যও। সব মিলিয়ে বলা যায়, বিচিত্র ধারায় বাংলাদেশের উপন্যাস বিকশিত হয়েছে।

গ্রামীণ মানুষের জীবন ও শহুরে জীবন, ব্যক্তিক সংগ্রাম ও জাতিগত সংগ্রাম, ইতিহাস ও রাজনীতি-সবকিছুই বাংলাদেশের উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। চরিত্রচিত্রণ, ভাষা, আখ্যানশৈলী ইত্যাদি নানা দিক থেকে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকেরা।

কাকতাড়ুয়া উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক পরিচিতি

সেলিনা হোসেইন

সেলিনা হোসেন ১৯৪৭ সালের ১৪ই জুন রাজশাহীতে জন্ম গ্রহন করেন।

তঁার পিতার নাম মোশারফ হোসেন, মাতার নাম মরিয়মন্নেসা বকুল।
তিনি পিতামাতার চতুর্থ সন্তান।

১৯৬০ এর দশকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার সময়ে লেখালেখির
সূচনা। এ পর্যন্ত বড়দের জন্য তঁার প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা
তেরিশ, ছোটদের পঁচিশ।



কাকতাড়ুয়া উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক পরিচিতি

সেলিনা হোসেইন

✓
তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হচ্ছে : হাঙর নদী গ্রেনেড,
পোকামাকড়ের ঘরবসতি, নীল ময়ূরের যৌবন, গায়ত্রী সন্ধ্যা, পূর্ণ ছবির
মগ্নতা, যমুনা নদীর মুশায়েরা, ভূমি ও কসুম। একুশে পদক, বাংলা
একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার সহ পেয়েছেন দেশের প্রধান প্রধান সব পুরস্কার।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসাবে পেয়েছেন সুরমা চৌধুরী আন্তর্জাতিক স্মৃতি
পুরস্কার(ভারত)।

২০১০ কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সন্মানসূচক ডিলিট
উপাধিতে ভূষিত করে।

কর্মজীবনে তিনি বাংলা একাডেমীর পরিচালক ছিলেন।



উপন্যাসের আলোচনা:

কাকতাড়ুয়া

এক চাচি আর চাচাতো বোন কুন্তি ছারা তিন স্কুলে আপন বলতে কেউ নেই। সে বছর দুয়েক আগের কথা।

বাবা - মা ছাড়াও ছিল দুই বোন আর এক ভাই। সবচেয়ে ছোট বোন বিনুর বয়স ছিল দেড় বছর। ছিল পিঠাপিঠি এক ভাই তালের আর বোন শিলু। এই ভাই- বোনদের নিয়ে ভালোই কাটছিল তার দিনগুলো। সেই থেকে বুধা একা।

যখন যেখানে খুশি রাত কাটায়। যা খুশি তাই করে। যখন যা জোটে তাই দিয়ে ক্ষুণ্ণ বৃত্তি করে।

অন্যদের মতো গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাবে না।



প্রথমে পুড়িয়ে দিল শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আহাদ মুন্সীর বাড়ি।
মুক্তিযোদ্ধাদের নেতা শিল্পী শাহাবুদ্দিন তাকে মাইন পেতে ক্যাম্পটা এক
সাহসী কিশোর মুক্তিযোদ্ধার কাহিনী।

বুধা কিশোর হলেও অসীম সাহস আর মানবিক গুণাবলির অধিকারী সে।
এই হচ্ছে কাকতাড়ুয়া উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বুধার কথা। গায়ের লোক
তাকে পাগল বললেও সে আসলে এক 'সাহসী বালক'।

শান্তি কমিটি আর রাজাকার কমান্ডারের বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়।
ক্যাম্পের বাস্কারে মাইন পেতে রেখে আসে। ভয় পায় না। বুধার এই- যে
সাহসী হয়ে বেড়ে ওঠা এবং তারপর মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়া - এই
দিকটিকে সেলিনা হোসেন চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।



তারা খুব বড় ভূমিকা পালন করেনি। তবে উপন্যাসের কাহিনী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এই চরিএগুলো হচ্ছে কুস্তি, নোলক বুয়া, হরিকাকু, আহাদ মুঙ্গি, আলি, মিঠু, ফুলকলি, রাজাকার কুদ্দুস ও মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী শাহাবুদ্দিন।

বুধা যে মুক্ত মানুষ, সেটা বোঝাবার জন্য যে বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন, তাও চমকপ্রদ। এ রকম প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ :

(ক) পথ ওকে ডাকে - আয়। ও হেসে বলে, এই তো এসেছি। দেখ আমাকে। পথ ওকে দেখে।

(খ) ঘুমুবার জায়গা নেই তো কী হয়েছে? দোকানের বারান্দা আছে, গাছতলা আছে, হাটের চালা আছে, ঘাটে বাধা নৌকা আছে।

মিলিটারির নির্মম হত্যাকাণ্ড আর যে বর্বরতার দৃশ্য সে দেখেছে, সেই বর্ণনাও সমান আকর্ষক: গুলি। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সালাম চাচা।

গুলি। পড়ে গেল রবিদা।

গুলি। পড়ে যায় একসঙ্গে অনেকে।

এখানে পৌছানোর পর উপন্যাসিক সেলিনা হোসেন বুধার মধ্য দিয়ে 'প্রতিশোধ' গ্রহণের কথা বলেন।

কাকতাড়িয়া সেলিনা হোসেন

বুধা

রাত পোহালে দিনের আলো, সুখি্য ডুবলে আঁধার। ওর কাছে দুটোই সমান। ঘুরতে ঘুরতে যে কোথায় যায় সে হিসেব রাখে না। ওর কাছে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সব সমান। মনে করে যদিকে চোখ যায়, সেদিকেই ওর জন্য রাস্তা খোলা।

পথ ওকে ডাকে আয়। ও হেসে বলে, এই তো এসেছি। দেখ আমাকে।

ঘুমাবার জায়গা নেই তো কী হয়েছে? দোকানের বারান্দা আছে; গাছতলা আছে, হাটের চালা আছে, ঘাটে বাঁধা নৌকা আছে। নৌকার ছইয়ের ভেতর দিবি্য ঘুমিয়ে থাকা যায়। আর সেসব কিছু না পেলে গেরস্ত বাড়ির কাছারির বারান্দা আছে।

সব বেলার ভাত নেই তো কী হয়েছে? ফলপাকুড় আছে, নদীর পানি আছে। নোলক বুয়ার মুড়ি ভাজা আছে। চায়ের দোকানে কাজ করে দিলে চা-বিস্কুট জোটে। ওটুকু খেয়ে রাত কাবার করে দিতে পারে। তা ছাড়া কখনো-সেখানে গেরস্ত বাড়িতে ছোট-খাটো কাজের ডাক পড়ে। তখন অড়হর ডালের সঙ্গে ভাত জোটে। নইলে কেউ নুন-পান্তা দেয়।

ও ভয় পায় না। ভয় ওকে কাবু করে না। আসলে ভয় কী, তা ও জানেই না। ও ছোটবেলায় ভূতের গল্প শোনে নি। কেউ ওকে জুজুর ভয় দেখায় নি। ও তো নিজের নিয়মে বড় হয়েছে।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছিস, বুধা? সোনার ঘরে।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছিস, বুধা? সোনার ঘরে। যার ঘর নেই তার চারদিকে তো সোনার ঘরই থাকে। ও তাইরে নাইরে করতে করতে পথে হাঁটে। গান গায়। গানে বুক উজাড় করে দেয়। গান ওর ভীষণ প্রিয়। আখড়ার গান শুনে ও গান শেখে। একবার শুনলেই গাইতে পারে। ওর মনে হয়, যার ভেতরে গান থাকে সে অনেক কিছু করতে পারে। সে একটা ভালো মানুষ হয়।

সেই বিভীষিকাময় রাত

কারও খেতে কামলা খাটে, কারও গরু চরায়, কারও মোট বয়। জেলেনৌকায় মাছ ধরে। মুদির দোকানে বসে কেনাবেচা করে। চায়ের দোকানে চা বানায়। খদ্দেরের সামনে চায়ের কাপ নিয়ে যায়। ধানখেতে নিড়ানি দেয়। আরও কত কী! ওর কাজের শেষ নেই।

গাঁয়ের লোকে বলে, ও পাগল হয়নি। শক্ত হয়ে গেছে। জমে শক্ত হয়ে যাওয়া যাকে বলে।

চোখের সামনে মা-বাবা, চার ভাই-বোনকে মরে যেতে দেখলে কেউ কি নরম থাকে? নাকি থাকতে পারে? তার জীবনটা তো আর স্বাভাবিক নিয়মে চলে না। চলার উপায় থাকে না। কলজে খুবলে খায় শকুন। ও দুঃখকে হিংস্র শকুনই ভাবে। এসব ভাবলে ও মগজের ভেতরে শুনতে পায় শকুনের পাখা ঝাপটানি। শকুনের শক্ত চওর ঠোকরানোর শব্দ।

ঘরের ভেতরে ওর বাবার শরীর মোচড়াতে থাকে। মোচড়াতে মোচড়াতে স্থির হয়ে যায় চোখের মণি। ঘরে একটিমাত্র কৃপি। ফুরিয়ে আসছে তেল। ও দেখতে পায় একপাশে পড়ে আছে মা। তার বুকে ছোট তিনু। তিনুর বয়স দেড় বছর। তিনুর জন্যে কি একটা গান গাইবে? গান শুনে কি জেগে উঠবে তিনু? দেখতে পায় ঘরের অন্য পাশে মেঝেতে গড়াচ্ছে শিলু আর তালেব। ওর ছোট দুজনে। দুজনে পিঠাপিঠি। রাত পোহানোর আগে বিনুও চলে যায়। বিনু ওর পিঠাপিঠি বোন। কত স্মৃতি ওর সঙ্গে।

একসময় রাত পোহায়। সকাল হতে ও ঠাণ্ডা নিপ্রাণ শরীরগুলো হাত দিয়ে দেখে সব জমে শক্ত হয়ে গেছে।

মুক্তি

সেবার কলেরায় মহামারিতে উজাড় হয়ে যায় গাঁয়ের অর্ধেক লোক। মাঝে মাঝে নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করে, কীভাবে বেঁচে গেলাম। সেই মৃত্যু এবং অন্ধকার রাতের কথা মনে করলে ওর আর কোনো ভয় থাকে না। বুঝতে পারে না গাঁয়ের লোকে ওকে পাগল বলে কেন, আসলে ও তো একটি সাহসী বালক হয়েছে।

ওর মনে হয় ওটা বোলতার ডাক নয়, শব্দটা ওর চাচির কণ্ঠ। কামাই করতে পারিস না, বাপু?

ভাত খেতে খেতে ও শব্দটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। শক্ত হয়ে থাকা মগজের গায়ে শব্দটা ঠোঁকুর খায়। তোর মা-বাপ মরে খালাস। এখন জ্বালা আমার। পরের ছেলের বোঝা টানতে পারি না, বাপু। বোঝা! শব্দটা ওর শক্ত হয়ে থাকা বুকের মাটিতে বলের মতও লাফায়। ও ভাবতে থাকে তোর চাচার রোজগার নেই। তোর আটজন চাচাতো ভাইবোন, দিন চলে না।

আমি কামাই করব। তাহলে তুই আমাকে মুক্তি দিবি?

এত অল্পে কেন যে তোর চোখ লাল হয়ে যায়। ছোটবেলায় তুই খুব লম্ফা ছেলে ছিলি। একদম
মায়ের নেওটা। এক রাতে মানুষগুলো মরে যাওয়ার পর তুই যে কেমন হয়ে গেলি!

আমি ভেবেছিলাম আমার চোখটা পাথরের চোখ হয়ে গেছে। কিছু দেখতে পাই না,
মনে হয়, তুই আমার মুরষি। হয় আমার বাবা, না হয় চাচা।

কুন্তি

ও কতবার এমন করে নিজেকে আবিষ্কার করবে?

ও আর কখনো ওই বাড়িতে থাকার জন্য ফিরে যায়নি। গিয়েছে চাচির সঙ্গে দেখা করতে। কখনো ছোটো ভাইবোনগুলোকে ফলপাকুড়ের ভাগ দিতে গিয়েছে। বারান্দায় বসে দুদণ্ড গালগল্প করেছে। গুড়মুড়ি দিয়েছে। ও কখনো খেয়েছে, কখনো খায় নি। শুধু ওর মনে হয়েছে ও গেলেই কুন্তির চোখ ছলছল করত। ও একটি কথাও বলত না। চুপচাপ বসে থাকত। অপলক তাকিয়ে থাকত। ওই বাড়িতে গেলেই ওর বুক ভার হয়ে যেত। ও ওর শক্ত হয়ে যাওয়া বুকোর বোঝা আর বাড়িতে চাইত না।

যেদিন ও চাচির বাড়ি থেকে একবারের জন্য বেরিয়ে এলো সেদিন ভেবেছিল, সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার মানে কি মুক্তি?

কুস্তির কান্নাভেজা কণ্ঠস্বর শুনে ওর চোখ থেকে লাল আভা মুছে যায়। ও বুঝতে পারে ওর
বুকের ভেতরটায় জখম হয়েছে। ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছে। আশ্চর্য সম্পর্ক কী এমন?

তুমি চলে গেলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

তোর বিয়ের সময়

অনেকগুলো নাম

আমি কি একটা ছেলে হলাম? আমি তো এখন পথের ছেলে। এতিম।

তা হলে সম্পর্কটা কি এমন যে কারও কাছে ভালো, কারও কাছে খারাপ?

গাঁয়ের লোকে ওর নাম দিয়েছে কাকতাড়ুয়া। নোলক বুয়া ডাকে ছন্নছাড়া। হরিকাকুর জালে প্রচুর মাছ
উঠলে ওর দিকে তাকিয়ে ফোকলা গাল হেসে বলে, মানিকরতন। পাকা ধান কাটার সময় জয়নাল চাচা
ওকে বাবা ছাড়া কথা বলে না। বলে, সোনাবাবা।

হাটের দিনে ডালাভরা বাজার নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে হাশেম মিয়া বলে, ও খোকনবাবু, আজ তুই
আমার বাড়িতে ভাত খাব। গাঁয়ের গোবরকুড়ানি বুড়িটা ওকে গোবররাজা বলে ডাকে। অনেক দিন ও
বুড়িকে গোবর কুড়িয়ে দিয়েছে।

ও অনেক রকম মানুষ হতে চায়। কেন? যেমন, কুস্তির ভাবনার মতো ভালো। নলক বুয়ার ভাবনার মতো সাহসী। চাচির কথার মতো লাল চোখের মানুষ। ভরা মাছের জাল টেনে তুললে হরিকাকুর দুচোখের বিস্ময়ে লেখা হয় একটি শব্দ, শক্তিশালী। আর কী? বিশ্বাসী? হ্যাঁ। পরোপকারী? হ্যাঁ। সহৃদয়? হ্যাঁ। বন্ধুত্বসুলভ? হ্যাঁ। আর কী। সবকিছু, সবকিছু।

চাচির প্রতি ও কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। ভাবে, চাচি ওকে মুক্তির কথা বলে স্বাধীন মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দিয়েছে।

কী মজা স্বাধীন মানুষ, স্বাধীন মানুষ।

স্বাধীনতা ভীষণ আনন্দের। স্বাধীনতা খুব দরকার। আমি তো এখন স্বাধীন মানুষ।

একদিন ও কাকতাড়ুয়া খেলার সময় দেখতে পায় গাঁয়ে মিলিটারি এসেছে। পুলিশ গাঁয়ের রবি চোরকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় ওরা অনেক ছেলেমেয়ে ওদের পিছে পিছে থানা পর্যন্ত গিয়েছিল।

একটু পর বাজারের চালাগুলো দাউদাউ পুড়তে থাকে। কেউ কেউ হয় আগুনে পুড়ে, নয় গুলি খেয়ে মরেছে। অনেকে মারা যায়নি, কিন্তু আহত হয়েছে। যারা বেঁচে আছে তারা ছোট্টাছুটি করে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। ও নিজেও একটা মাটির হাঁড়ি নিয়ে দোবা থেকে পানি আনে। পানি আনতে আনতে ওর রাগ বাড়তে থাকে। ও মনে মনে ফুসতে থাকে। প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ওর বুকের ভেতর চুপচাপ শব্দ তোলে। একসময় আগুন নিভে গেলে আধা-পোড়া বাজারটার দিকে তাকিয়ে ওর চোখ লাল হতে থাকে। আগুনের ধোঁয়ায় তোরর চোখ লাল হয়ে গেছে।

পরদিন গাঁয়ের অনেক মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে থাকে। ছন্নছাড়া, আমার সঙ্গে চল। যদিকে দুচোখ যায়। কোথাও না কোথাও একটা আশ্রয় তো জুটবে। কিন্তু কেন যাব?

লড়াই

সবাই গেলে গায়ে কে থাকবে? কেউ না থাকলে ও একাই থাকবে। কেন পালাবে? যে পালায় সে ভীতু।

বড় জামগাছটার নিচে দেখা হয় হরিকাকুর সঙ্গে।

দেখ তো মানিকরতন, এই বয়সে কেউ কি বাড়িঘর ছেড়ে বেরোতে পারে?

তোমার সঙ্গে আমি কেন যাব? গাঁয়ে থাকবে কে? তোমার ভিটে দেখবে কে?

রানি ভয়জড়ানো কণ্ঠে বলে, যাচ্ছি রে, কাকতাড়ুয়া।

তুই কিন্তু আর কাকতাড়ুয়া খেলা খেলিস নে। মিলিটারি গুলি করতে পারে। দুষ্টুমি করিস না, কাকতাড়ুয়া।

আমি পালাব না। লড়াই করব।

চাচা কাজ খুঁজতে শহরে গিয়েছিল ছয় মাস। আগে। ফেরেনি। চাচি এখন গাঁয়ে নেই। ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি গেছে। লোকমুখে এসব খবর পায় ও। ওই বাড়িতে কুস্তিই ওকে নিয়ে যা একটু ভাবে।

ওই বাড়িতে কুস্তিই ওকে নিয়ে যা একটু ভাবে।

আবার মহামারী

মিলিটারির আক্রমণের পর দুই মাস গড়িয়ে গেছে। শুনতে পায় অনেকে ইন্ডিয়া চলে গেছে।

ওর চাচীও ফিরে এসেছে।

শুধু দূর থেকে দেখেছে কুস্তি বড় হয়েছে। ওকে দেখতে এখন অন্য রকম লাগে।

এর মধ্যে গাঁয়ে আবার মিলিটারি আসে। ক্যাম্প বানায়। ক্যাম্পের পাহারায় থাকে
ওদের কেউ কেউ। ওরা এ দেশের মানুষ হলে ও ওদের ভাষা বুঝতে পারবে না কেন?

গুলি। মুখ খুবড়ে পড়ে গেল সালাম চাচা।

গুলি। পড়ে গেল রবিদা।

গুলি। পড়ে যায় একসঙ্গে অনেকে।

দেখে পড়ে যায় মফিজ, শফি, মতি, আজাহার ভাই, মদন কাকু, শরিফ চাচা, আরও অনেকে। শুধু এই প্রথম ও কাফনের কাপড় ছাড়া কবর হতে দেখেছে। আর অনেক মানুষের একসঙ্গে একটা কবর হতে দেখেছে।

গণকবর কী, হাবিব ভাই?

এই যে সবাইকে একসঙ্গে গাদানো।

কলেরা সাত দিনের মাথায় চলে গিয়েছিল। এরা কি যাবে নাকি তাড়াতে হবে?

বঙ্গবন্ধু

চোখ লাল হলে ওর ভেতরে একটা কিছু করার ইচ্ছা প্রতিজ্ঞা হয়ে যায়। ও ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্নে নিজের বুকের ভেতরে আনন্দের জোয়ার বয়ে যাওয়া অনুভব করে।

ও বিড়বিড় করে বলে, তোমরা যারা আমাদের ঘর পোড়ালে, বাজার পোড়ালে, মানুষ মারলে, গায়ে গণকবর বানালে, লোকজনকে বাড়িঘর ছারালে, তোমরা কি এমনি এমনি চলে যাবে?

বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ ও কানু দয়ালের বাড়িতে বসে রেডিওতে শুনেছিল। সেই রক্ত গরম করা ভাষণ শুনে ও মধুকে বলেছিল, এখন থেকে তোরা আমাকে বঙ্গবন্ধু বলে ডাকবি।

সেই মধু আর নেই। আগুনে পুড়ে গেছে। ও চিনতে পারে নি কোনটা মধুর লাশ। মধুর বড় ভাই মিঠু লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে।



সেই রাতে বাবা মারা যাওয়ার পরও মা জীবিত ছিল। ওকে ডেকেছিল। বাবা বুধা, বাবা, বাবা রে?
আর কেউ ওকে কিছু বলেনি। টুপটুপ করে ঝরে গেছে কেবল।

ও মৃত্যুপুরীর স্তব্ধ শীতলতায় নিঃসাড় বসেছিল।

ভাবলে এখন আর মোচড়ায় না, শরীরটা তো জমাট শক্ত হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে হয়, কে যেন ডাকছে।

কদিন ধরে ও খেয়াল করছে গাঁয়ের কয়েকজন টাকাওয়ালা মানুষ যারা গাঁ থেকে পালায়নি, তারা
মিলিটারির সঙ্গে বেশ যোগাযোগ করছে। ওদের ক্যাম্পে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি, মাছ, ডিম, দুধ
পাঠাচ্ছে।

শান্তি কমিটি

মিলিটারি তো বিদেশি মানুষ। কিন্তু দেশের মানুষ কেন ওদের সঙ্গে মিশেছে? কেন বিদেশিদের মতো আচরণ করছে?

আলি হাসতে হাসতে বলে, আমি তো জানি তুই কী খাস রোদ খেলে
তোর পেট ভরে জোছনা খেলে তোর মন ভরে।
বৃষ্টির পানি খেলে তোর বুক ভরে বাতাস খেলে তোর মগজ ভরে, তুই
আর কী খাস রে, বুধা ?

সবাই মিলে অবাক হয়ে শোনে, গাঁয়ে শান্তি কমিটি হয়েছে। আহাদ মুপি
চেয়ারম্যান।

আমার নাম যুদ্ধ।



১৯৭৯- মুক্তিবাহিনীর হাতে আটক একদল
রাজ্যকার।

আলি ও মিঠু

আমি আপনার কাছে টাকা চাই না। আমি যার-তার কাছে হাতপাতি না। কী বললি ?

বললাম, আপনি তো শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। কিন্তু সারা দেশে যে অশান্তি। শান্তি কই ?

বিকеле চায়ের দোকানে বসে থাকার সময় ছেলেটির মনে হয় আলি আর মিঠুকে একদম একরকম লাগছে।

সৈনিকগুলো ওদের মেরে ভুত বানিয়ে ফেলবে। গ্রামটা হয়ে যাবে একটা শ্মশান।

তাকে ধরলে আমরা এখানে তিনজন। কিন্তু আমরা তিনজন নই, একজন ঠিক না ? হ্যাঁ ঠিক।

জয় বাংলা

ফেরার সময় ছেলেটি আলির কাছ থেকে এক শিশি কেরোসিন চেয়ে নিয়ে আসে। বলে, 'আমি গায়ে খেটে তোমার তেলের দাম শোধ দেব, আলি ভাই।'

তারপর দেশলাই ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে বড় মশালটা ছুড়ে মারে আটচালা ঘরের ওপর। একটা কাছারিঘরের ওপর। আর একটা রান্নাঘরে। অন্যটা গোয়ালে। দাউদাউ জ্বলে ওঠে ছনের চালা। মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে যায়। ঘুমন্ত মানুষগুলো জীবন নিয়ে বেরিয়ে আসতে ব্যস্ত।

জয় বাংলা খুশি যা হয়েছিল তা ঠিক আছে। তবে ভুলে যাস না যে এখন কাজের সময়।

মতিউর

আমরা চলে যাচ্ছি, জয় বাংলা। আহাদ মুন্নি আমাদের ছাড়বে না। ঠিকই সন্দেহ করবে। আজ রাতেই পালাব।

আলি বলে, আমরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে যাচ্ছি। ওই মিলিটারি ক্যাম্পটা উড়িয়ে দিতে হবে।

ভোরবেলা আহাদ মুন্নির বড় ছেলে ওকে কান ধরে টেনে তোলে ও ঘুম জড়ানো চোখে মতিউরের দিকে তাকায়।

মতিউর প্রচণ্ড রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে যায়। বৃদ্ধা নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকে।

পরদিন গাঁয়ের রাজাকার কমান্ডারের বাড়িতে আগুন লাগে। পুড়ে যায় সবগুলো ঘর। শুধু মানুষের জীবন বাঁচে, আর গরু-ছাগলগুলো বাঁচানো যায়। কোথা থেকে কীভাবে আগুন লাগল— হদিস করতে পারল না বাড়ির লোকজন।

ফুলকলি

রাজাকার কমাণ্ডার কাজের মেয়েটিকে আচ্ছা করে পিটিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিল। তার ধারণা, কাজের মেয়েটি রান্না করার পরে নিশ্চয় পাঠখড়িগুলো চুলোর পাশে রেখে দিয়েছিল। সেখান থেকে আগুন লেগেছে।

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি পাটখড়ি চুলোর পাশে রাখিনি, বুধা। আমি জানি না কীভাবে আগুন লাগল।

রাজাকার কমাণ্ডার যখন তাকে মারছিল তখনই বুঝেছিলাম যে এই মলমটা তোর লাগবে।

যুদ্ধ কোথায় ? আগুন লাগা কি যুদ্ধ ?
ধর, এক রকম তাই।

জয় বাংলা, জয় বাংলা। জয় বাংলা জয় বাংলা, ফুলকলি আবার ছুট দেয়।

রাজাকার কুদ্দুস

হাসছিস কেন? তোর হয়েছে কী? কমান্ডারের বাড়ি পুড়েছে তাতে গাঁয়ের মানুষ সবাই দুঃখ করছে।

হাতের কাছে পেলে তুলে একটা আছাড় মারব, শয়তান। মিঠু কোথায় বল? নদীর তলে খুঁজে দেখ।

দেশটা স্বাধীন হলে ফুলকলির আর দুঃখ থাকবে না। ওর ভেতরে দেশ স্বাধীন করার জোশ জেগে ওঠে।
পরদিন অনেক রাতে একজন মুক্তিযোদ্ধা আসে ওর কাছে। চুপিচুপি ডাকে, জয় বাংলা।

শাহাবুদ্দিন

ওকে দুহাতে বুক জড়িয়ে ধরে মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন। শাহাবুদ্দিন তো ছবি
আঁকে। আর্ট কলেজে পড়ে। তা হলে শাহাবুদ্দিনও যুদ্ধ করছে। ওহ যুদ্ধ,
যুদ্ধ।

ওই যে বাড়িগুলো পুড়িয়েছিস, এটাও যুদ্ধ। এবার বড় যুদ্ধ করতে হবে।

মিলিটারির ক্যাম্পটা উড়িয়ে দেব আমরা তুই থাকবি আমাদের সঙ্গে।

শোন কয়টা সেপাই পাহারা দেয়, কয়জন তাঁবুর ভেতর থাকে,
মেশিনগানটা কোথায় ফিট করে রেখেছে—সব খবর নিয়ে আসবি। আমি
আবার দুদিন পরে আসব।



ওকে আর ভয়ের ভূত ধরতে পারবে না,

বরং ও এখন ওর শৈশবের আনন্দের দিনগুলো খুঁজে পায়। যখন বাবা-মা
বেঁচেছিল সে সব দিন। কত দিন বাবার সঙ্গে হাটে গিয়েছে।

ইলিশ মাছ কিনেছে। মা রান্না করেছে।

ইলিশের গন্ধে ওর ভাইবোনেরা বসে থাকত চুলোর পাশে।

শীতকালে মা ভাপা পিঠা বানাত।কী আনন্দের ছিল সে সব দিন।

স্বাধীনতার স্বপ্নে ও আবার সে সব দিনের আনন্দ ফিরে পেয়েছে। এখন ওর আর
কোন ভাবনা নেই। মরণেও ভয় নেই।

পরদিন ও একগাদা পেয়ারা নিয়ে মিলিটারি ক্যাম্পে যায়। গাঁয়ের স্কুলঘরটি দখল
করে ওরা ক্যাম্প বানিয়েছে।



লোহার টুপি

মা-বাবা মরে যাওয়ার পর থেকে ওর স্কুল বন্ধ। এর মধ্যে দুই বছর পেরিয়েছে।

এমন বৃষ্টিমুখর শ্রাবণের রাতে ওর কেয়ামতের দিনের সূর্যের কথা মনে পড়ছে কেন ? সূর্য কি শব্দ করে ?
বৃষ্টির শব্দ নয়, চারদিকে তুমুল ঘন্টাধ্বনি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম স্কুলের দিকে যাচ্ছে। নদীর
ধারে গাছগুলোর পেয়ারা খেয়েই তো ওর রাত কেটে যায়। ও বেশ

ক্যাম্পে পৌঁছে ও প্রথমে নিজে একটি পেয়ারায় কামড় দেয়। আরেকটি পেয়ারা এগিয়ে দেয় প্রথম
সৈনিকটির দিকে ইশারায় বলে, খাবে ?

লোকটি দাঁত কেলিয়ে হেসে পেয়ারাটা ছোঁ মেরে নিয়ে নেয় ওর হাত থেকে। কামড় দিয়ে বলে, বহুত
আচ্ছা, বহুত মিঠা আওর হয় ?

ছেলেটি সবগুলো পেয়ারা বের করে মাটিতে ফেলে দেয়। আশপাশ থেকে আরও দু-চারজন সেপাই
এগিয়ে আসে। লোহার টুপি কি মানুষের মগজ খায় ?

কাকতাড়িয়া

ওরা ওকে কাকতাড়িয়া বানানোর উৎসবে মেতে ওঠে। হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে চায় মার্ঠের মাঝখানে। মারো নী মেরেই ফেল। লোকে জানুক যে আমি স্বাধীনতার যুদ্ধে শহিদ হয়েছি। তখন একজন ওর গালে ঠাস করে চড় মারে। ও রুখে দাঁড়িয়ে বলে, আমি শোধ নিতে জানি। আজ ছেড়ে দিলাম। বাপ-মা মরা ছেলে বলে রেহাই পেলি।

ওরা জানে গুলি করতে জানে যে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলতে। পেয়ারা খাওয়ার কৃতজ্ঞতায় ওর শাস্তি মওকুফ করে দেওয়ার কথা ওদের মনেই আসে না।

ওরা যেভাবে ভাগতে বলেছে, তার মানে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পেরিয়ে যেতে হবে ক্যাম্পের সামনের মার্ঠটি। সেটাও করতে পারবে না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, এখানে ওকে আবার ফিরে আসতে হবে। ও খুব শান্ত পায়ে হেঁটে মার্ঠটা পার হয়। হাঁটতে কষ্ট হয়। মাথা ঝিমঝিম করে।

কিন্তু শরীরের কষ্টটা তেমন নয়, ভেতরে সুখের পুঁটিমাছ রূপালি ঝিলিক তুলে সাঁতরায়। ও বুঝে যায়, আজ রাতে ওর পোড়া ঘরে একটি মশাল তৈরি হবে। সেটি পুড়িয়ে দেবে আহাদ মুন্সির নতুন তোলা ছনের ঘর। পরদিন সকালে সেই তিন রাজাকার যখন ওকে খুঁজতে আসে, দেখতে পায় প্রবল জুলে ও কোকাচ্ছে।

তা হলে চেয়ারম্যানের বাড়িতে আগুন দিল কে? আরেকজন রাজাকারের প্রশ্ন। রাতের বেলা নিশ্চয় মুক্তিবাহিনীর কেউ আসে। আমি এখন বুঝে গেছি। আমরা আরও সতর্ক না হলে মুক্তিবাহিনী আমাদের মেরে ফেলবে। আমার মনে হয় বুধারও মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগ আছে। ও কি বন্দুক চালাতে জানে? নাকি গ্রেনেডের পিন খুলতে শিখেছে? দেখিস আজ রাতে ওটা মরবে। জ্যাস্ত থাকতেই তো ও ভুত হয়েছে।

যুদ্ধ ও যুদ্ধ? জয় বাংলা? বঙ্গবন্ধু? ও চমকে উঠে বসে। এত নামে ওকে ডাকলে ওর সব দুঃখ ধুয়ে যায়।
ও হেসে ওঠে, ওটা তো ভাল্লুকের জুর যায় আর আসে। যুদ্ধের সময় কি জুরের কথা এত ভাবলে চলে?
সুস্থ না থাকলে যুদ্ধ করবি কীভাবে? শরীরের তো শক্তি চাই। ঠিক বলিনি? বলেছ।

মাইন

শুনেছি ওরা একটা বাঙ্কার করবে। কাল বাঙ্কার করে ফেললে ওদের হারিয়ে দেওয়া কঠিন হবে। তার আগেই ক্যাম্পটা উড়িয়ে দিতে হবে। এই তো ?
হ্যাঁ। আমি একটা মাইন নিয়ে এসেছি। যেদিন বাঙ্কারটা বানাবে সেদিন তোকে মাটিকাটার দলের সঙ্গে কাজ করতে হবে। কাজ শেষ হলে যেভাবে হোক এই মাইনটা মাটির নিচে রেখে আসতে হবে। সাবধানে থাকাটা মুক্তিযুদ্ধের কৌশল?

আচ্ছা বলো তো ওরা বাঙ্কার করবে কেন? ওরা বুঝতে পেরেছে যে নদীপথে এসে আমরা আক্রমণ করতে পারি। তা এমন সতর্ক ব্যবস্থা। ও আবার হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসতে হাসতে ওর পেটে খিল ধরো শাহাবুদ্দিন তখনই সিদ্ধান্ত নেয় যে, দেশ স্বাধীন হলে ও ছেলেটির একটি ছবি আঁকবে।

ক্যাম্পটা যখন মাইন ফেটে হাউইবাজির মতো ছিটকে উঠবে, তখন আমরা নদীপথে সরে পড়ব।

শহিদ মধু

দুপুরের পর রোদ কমে গেলে ও গুটিগুটি পায়ে মিঠুদের বাড়িতে হাজির হয়।তাকে কত বলি রোজ এসে ভাত খেয়ে যাবি। কেন যে তুই আসিস না। আমার সামনে বসে তোকে ভাত খেতে দেখলে আমার কষ্ট কমে যায়। বুকের শূন্য জায়গাটা ভরে ওঠে। মনে হয়, এই বুঝি দেশটা স্বাধীন হলো।

আমার মধুকে তো পাকিস্তানিরা মেরে ফেলল। মিঠুও বাড়ি ছেড়েছে। মেয়েটা স্বপ্নেরবাড়িতে থাকে। তোকে পেলে
তোর খালু আর আমি দুঃখ ভুলব। এখন থেকে তোকে আমি মধু বলে ডাকব, কেমন?

ও একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, শুধু মধু না, শহিদ মধু। শহিদ মধু? ও নিজেকে বলে, কী সুন্দর দৃশ্য! কাকেরা ভাত খেলে শহিদের মায়েদের বুক জুড়ায়। কুন্তি শক্ত কণ্ঠে বলে, আমি জানি তোমার অনেক কাজ। আমিও তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব।

কুস্তি

তুমি তো জানো না যে আমি চাচা-চাচির কবর পরিষ্কার করে রাখি। দেখতে পায় কুস্তি আকন্দ, ভাঁটফুল, ধূতরা-এসব গাছ লাগিয়েছে কবরের মাথায়। কী সন্দূর দেখাচ্ছে কবরগুলো। ও মায়ের কবরের সামনে বসে বলে, মা, তুমি আমাকে দোয়া করো। তোমার ছেলের মাথায় অনেক কাজ।

কাঁদিস না থাম আমি তো জানি তুই ছাড়া আমার আর আপন কেউ নাই। তুই কাঁদলে আমার খুব কষ্ট হয়। দে না মরণ। যুদ্ধ ছাড়াও মরণ থাকে।

কুস্তির আজ হলো কী? কুস্তি যেন ধাম করে বড় হয়ে গেল।

ফজু মিয়া

মাকে এগুলো দিলে মা রাঁধবে। তবেই না আমাদের খাওয়া হবে।
ফজু চাচা, আমি আপনাদের সঙ্গে মাটি কাটব।

আয় আমাদের সঙ্গে। দলে থাকলে আহাদ মুন্নি তোকে না করতে পারবে না। বান্ধার কাটা শুরু হয়েছে।

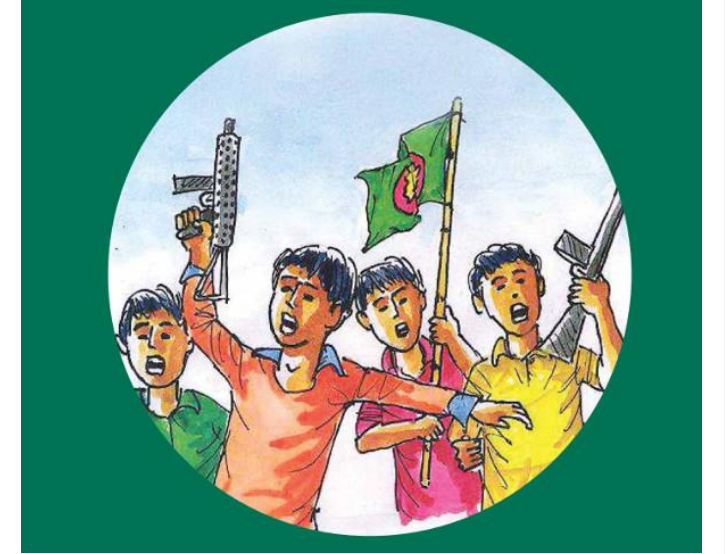
বুধাকে দলে নেওয়ার জন্য ফজু মিয়াকে বকাবকি করে। কিন্তু একটু পরে কাজে ওর আগ্রহ দেখে খুশি হয়। ঢুকলে আর উঠতে মন চায় না। দেখো সেপাইগুলো ওটার ভেতর থেকে আর উঠতে চাইবে না। ছেলেটি চোখ নাচিয়ে বলে, রাতের বেলা ওরা বান্ধারে শুয়ে হাউইবাজি দেখবে। আহা রে আমি যদি এই বান্ধারে থাকতে পারতাম।

ফজু মিয়া ওকে এক পাশে টেনে ফিসফিসিয়ে বলে, আল্লাহ্ মাফ করুক। এখানে থাকার ভাগ্য যেন আমাদের না হয়।

কবর!

ও ফজু মিয়ার পা ধরে সালাম করে ভাঁ দৌড় দেয়। ও উত্তেজিত হয়ে বলে, বকর বকর, কবর, কবর। শাহাবুদ্দিন ভাই ওদের কবর।

সেই মুহূর্তে কয়েকজন সেপাই বাঙ্কারে পজিশন নেওয়ার জন্য ঢুকলে পায়ের চাপে বিস্ফোরিত হয় মাইন। বুকোর ভেতর ধরে রেখেছে মুক্তিযুদ্ধ।



বিগত বছরের এস.এস.সি পরীক্ষায় আসা জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন-

- ১) উপন্যাসের আখ্যানভাগ কী ? [ঢা, বো, ২০]
- ২) 'কাকতাদুয়া' উপন্যাসের মিঠুর ভাইয়ের নাম কী ? [সি. বো.১৬] [ঢা, বো, ২০]
- ৩) বুধা দুঃখকে কী ভাবে ? [রা. বো, ২০ ' ব, বো, '১৯]
- ৪) শাহাবুদ্দিন কার ছবি আঁকবে? [রা. বো, ২০]
- ৫) 'কাকতাদুয়া' উপন্যাসে বর্ণিত মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার কে? [চ. বো. ১৬]
- ৬) মতিউর কী কারণে ফজু মিয়াকে বকাবকি করেছিল? [য. বো, ২০]
- ৭) শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিল ? [কু. বো, "২০]
- ৮) তিনুর বয়স কত ? [কু. বো, "২০]

বিগত বছরের এস.এস.সি পরীক্ষায় আসা জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন-

- ৯) বান্ধারের তদারকি করছিল কে? [ঢা, বো, ২০]
- ১০) 'মেশিনগান বল, আমার নাম মেশিনগান' – বুধা কাকে কথা বলেছে? [চ. বো. ২০]
- ১১) শামুকের খোলটা কিসের মতো লাগে বুধার? [সি. বো ২০]
- ১২) মিলিটারি কীভাবে গাঁয়ে প্রবেশ করে? [সি. বো. ২০]
- ১৩) কুদ্দুস বুধার কাছে মিঠুর খাঁজ জানতে চাইলে সে কী বলে? [ব. বো "২০]
- ১৪) বুধা ঘুমের মধ্যে কিসের স্বপ্ন দেখে? [ব. বো "২০]
- ১৫) 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে ছবি আঁকার মানুষ কে? [দি, বো, '২০]
- ১৬) বুধার মতে তিনজন এক হলে কী হয়? [দি, বো, '২০]

বিগত বছরের এস.এস.সি পরীক্ষায় আসা জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন-

- ১৭) বুধার দৃষ্টিতে লোহার টুপি পরা মানুষেরা কী করে? [ম. বো. ২০]
- ১৮) বুধা রাজাকার কমান্ডারের বাড়িতে আগুন ধরিয়েছিল কেন? [ম. বো. ২০]
- ১৯) শাহাবুদ্দিন বুধার কী ধরনের ছবি আঁকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল? [রা. বো, ১৯]
- ২০) বুধা হাবিব ভাইয়ের কাছে কী জানতে চেয়েছিল? [রা. বো, ১৯]
- ২১) কোন ধরনের মানুষকে বুধার মানুষ মনে হয় না? [সি. বো, '১৯]
- ২২) আহাদ মুন্নির চোখ কপালে ওঠে কেন? [সি. বো, '১৯]
- ২৩) চাচি বুধাকে কিসের স্বপ্ন দিয়েছেন? [দি. বো, ১৯]
- ২৪) গায়ের লোকেরা বুধাকে কাকতাড়ুয়া ডাকে কেন? [য. বো, ১৯ ']

বিগত বছরের এস.এস.সি পরীক্ষায় আসা জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন-

- ২৫) উপন্যাসের আঙ্গিক ও গঠনকৌশলের দিক কোনটি? [দি. বো, ১৯]
- ২৬) বুধা কার বাড়িতে বসে সাতই মার্চের ভাষণ শুনেছিল? [চ: বো, '১৯]
- ২৭) বুধা প্রায়ই কী সাজত? [কু. বো, " ১৯]
- ২৮) বুধা আলির কাছ থেকে কেরোসিন এনেছিল কেন? [ঢা, বো, "১৯]
- ২৯) শাহাবুদ্দিনকে নিয়ে বুধা কিসের শব্দ শোনার জন্য বসে থাকে? [ঢা. বো. ১৯]
- ৩০) বিনু হাসলে কী মনে হতো? [ব. বো " ১৯]
- ৩১) বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক কে? [সকল বোর্ড '১৮]
- ৩২) শাহাবুদ্দিনের দৃষ্টিতে বুধা বুকুর ভেতর কী ধরে রেখেছে? [সকল বোর্ড '১৮]

বিগত বছরের এস.এস.সি পরীক্ষায় আসা জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন-

- ৩৩) আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জনক কে? [ঢা. বো, " ১৭]
- ৩৪) কার নির্দেশনায় বুধা মিলিটারি ক্যাম্পে মাইন পুঁতে এসেছিল? [রা. বো, ১৭]
- ৩৫) হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসটি কার লেখা? [য. বো, ১৭ ']
- ৩৬) গায়ের লোকেরা বুধার নাম কী রেখেছে? [য. বো, ১৭ ']
- ৩৭) চাচির মুখে কোন শব্দটি শুনে বুধা হাঁচট খায়? [কু. বো, ১৭ ']
- ৩৮) বুধার ছোট বোনের বয়স কত ছিল? [কু. বো, ১৭ ']
- ৩৯) কে রাজাকার কমান্ডারের বাড়িতে আগুন দিয়েছিল? [চ: বো, ' ১৭]

বিগত বছরের এস.এস.সি পরীক্ষায় আসা জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন-

- ৪০) 'জননী' উপন্যাসটি কার লেখা? [চ: বো, ' ১৭]
- ৪১) অপূর্ব চোখ ছিল কার? [সি. বো, '১৯]
- ৪২) গেরস্তের উঠোনে কী আছে? [য বো, "১৯]
- ৪৩) ফুলকলি বুধাকে কী নামে ডাকতে চায়? [ব. বো " ১৭]
- ৪৪) বুধা কয়টি মশাল বানিয়েছিল? [দি, বো, ' ১৭]
- ৪৫) নিজের নিয়মে বড় হয়েছে কে? [দি, বো, ' ১৭]
- ৪৬) 'মেশিনগান বল, আমার নাম মেশিনগান – বুধা কাকে এ কথা বলেছে? [ঢা, বো, " ১৬]
- ৪৭) গ্রাম থেকে কয় দিনের মাথায় কলেরা চলে যায়? [রা. বো. ১৬]
- ৪৮) বড় জামগাছটার নিচে কার সঙ্গে বুধার দেখা হয় ? [য বো, "১৬]

বিগত বছরের এস.এস.সি পরীক্ষায় আসা জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন-

- ৪৯) আহাদ মুন্সির সাথে কয়জন রাজাকার ছিল ? [য, বো, ১৬]
- ৫০) 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে আর্ট কলেজের ছাত্রটি কে ? [কু. বো, '১৬]
- ৫১) আহাদ মুন্সির ছেলের নাম কী ? [চ: বো, '১৬]
- ৫২) নোলক বুয়া বুধাকে কী নামে ডাকত? [সি. বো, '১৬]
- ৫৩) বুধার মা-বাবার কবর কে পরিষ্কার করে? [ব. বো " ১৬]
- ৫৪) নোলক বুয়া বুধাকে কী খেতে দেয়? [চ. বো. ১৬]
- ৫৫) উপন্যাসের প্রধান উপাদান কী? [দি, বো, ' ১৬]
- ৫৬) বুধার চাচাত ভাই-বোন কতজন? [ঢা, বো, " ১৫]

বিগত বছরের এস.এস.সি পরীক্ষায় আসা জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

- ১) আলো-আঁধার বুধার কাছে সমান কেন? [ঢা, বো, ২০] [দি, বো, ' ১৭]
- ২) 'এমন খুশি আমার জীবনে আর আসেনি'– বুধার এ উক্তির কারণ কী? [ঢা, বো, ২০]
- ৩) “দিন যাপনে ওর কোনো কষ্ট নেই।”— কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে ? [সি. বো, ' ১৯]
- ৪) “এবার মৃত্যুর উৎপাত শুরু করেছে ভিন্ন রকমের মানুষ।”— বাক্যটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? [রা. বো, ২০]
- ৫) ‘আমরা তিনজন নই, একজন। কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? [য. বো, " ২০]

বিগত বছরের এস.এস.সি পরীক্ষায় আসা জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

- ৬) ফজু মিয়া সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরতে চায় কেন? [য. বো, " ২০]
- ৭) বুধা নিজের জ্বরকে ভাল্লুকের জ্বর বলছে কেন? [কু. বো, "২০]
- ৮) যুদ্ধের সময় কত জ্বালা যে সহ্যে হয়' বুধা একথা বলেছে কেন? [কু. বো, "২০]
- ৯) ফুলকলি বুধার দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকায় কেন? বুঝিয়ে লেখ। [চ. বো. ২০]
- ১০) 'একটি ভয়াবহ কুটিল রাত'- বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. ২০]
- ১১) বুধা তার চাচির বাড়ি থেকে চলে যায় কেন? [সি. বো, '২০: চ. বো, '১৬]
- ১২) বুধা সেনাবাহিনী ক্যাম্পে পেয়ারা নিয়ে গিয়েছিল কেন? [সি. বো, '২০]
- ১৩) 'ভেতরে সুখের পুঁটিমাছ রূপালি ঝিলিক তুলে সাঁতরায়'— বুধার এই অনুভূতির কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। [ব. বো '২০]

বিগত বছরের এস.এস.সি পরীক্ষায় আসা জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

- ১৪) “লোকে জানুক যে, আমি স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ হয়েছি।” – বুধার এ উক্তি কী প্রকাশ পেয়েছে? [ব. বো '২০]
- ১৫) ‘ভয় ওকে কাবু করে না’- কেন? [ঢা, বো, ১৭; চ. বো, '১৬; দি. বো, ২০]
- ১৬) কুস্তি অবাক হয় কেন? [দি. বো, ২০]
- ১৭) বুধার চাচি কেমন স্বভাবের মহিলা ছিলেন? বুঝিয়ে লেখ। [ম. বো '২০]
- ১৮) হরিকাকুরা গা ছেড়ে চলে যাবে শুনে বুধা কষ্ট পেয়েছিল কেন? বুঝিয়ে লেখ। [ম. বো '২০]
- ১৯) বুধা ফজু মিয়ার পা ধরে সালাম করেছিল কেন? [ঢা, বো, '১৯]
- ২০) শাহাবুদ্দিন বুধার জন্য উৎকণ্ঠায় ছিল কেন? [রা. বো, '১৯]
- ২১) ‘এক হওয়ার এখনই তো সময়’ কথাটি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? [রা. বো, '১৯]

বিগত বছরের এস.এস.সি পরীক্ষায় আসা জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

- ২২) বুধা ফুলকলিকে জয়বাংলা ডাকতে চায় কেন? ব্যাখ্যা কর। [য. বো, '১৯]
- ২৩) দেশ স্বাধীন হলে শাহাবুদ্দিন বুধার ছবি আঁকবে কেন? ব্যাখ্যা কর। [য. বো, '১৯]
- ২৪) 'তোকে দেখেই বুঝতে পারছি দেশটা স্বাধীন হবে' – মিঠুর একথা বলার কারণ কী? [চ. বো, '১৯]
- ২৫) আহাদ মুন্সি কেন পাকিস্তানি সেনাদের পক্ষ নিয়েছে? [চ. বো. ১৯]
- ২৬) 'ছেলেটি এক আশ্চর্য বীর কাকতালুয়া – শাহাবুদ্দিনের এ উপলব্ধির কারণ কী? [সি. বো. ১৯, ব, বো, '১৬]
- ২৭) "এখন শব্দটা শোনার জন্য বসে থাকবা" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [সি. বো, '১৯]
- ২৮) 'এখন আর বুধার মরণেও ভয় নেই'- কথাটি কেন বলা হয়েছে? [য. বো, " ১৭]

বিগত বছরের এস.এস.সি পরীক্ষায় আসা জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

- ২৯) “আমি যার তার কাছে হাত পাতি না” – বুধা একথা কেন বলেছিল? [দি. বো, ১৯]
- ৩০) “তুই আর কী খাস রে বুধা?” – একথা কে এবং কেন বলেছিল? [দি. বো, ১৯]
- ৩১) বুধার মাটি কাটার দলে যোগদানের কারণ ব্যাখ্যা কর। [সকল বোর্ড ‘১৮]
- ৩২) বুধার চাচির চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা কর। [সকল বোর্ড ‘১৮]
- ৩৩) পাকিস্তানি সেনারা ক্যাম্পে বান্ধার বানিয়েছিল কেন? [রা. বো. ১৭]
- ৩৪) মতিউর বুধাকে চিবিয়ে খেতে চেয়েছে কেন? [য. বো, ১৭]
- ৩৫) ‘নিজের বোঝা নিজেই বইব’ – বুধার এমন ভাবনার কারণ ব্যাখ্যা কর। [কু. বো, “২০]
- ৩৬) আল্লাহ মাফ করুক। এখানে থাকার ভাগ্য যেন আমাদের না হয়— কে, কথাটি কেন বলেছে? [সি. বো. ১৭]

বিগত বছরের এস.এস.সি পরীক্ষায় আসা জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন-

- ৩৭) গাঁয়ের মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে থাকে কেন? [ঢা, বো, '৪৬]
- ৩৮) যে মানুষের দৃষ্টিতে ভাষা নেই, বুধার মতে সে মানুষ কেন মানুষ নয়? [ঢা, বো, '৪৬]
- ৩৯) গণকবর বলতে কী বোঝ? [ঢা, বো, " ৪৫]
- ৪০) বুধা শাহাবুদ্দিনকে স্যালুট করে কেন? [য. বো, " ৪৬]
- ৪১) বুধার কাছে দিন-রাত সবই সমান কেন? [ব. বো ' ৪৬]
- ৪২) বুধা অনেক রকম মানুষ হতে চায় কেন? [দি. বো, ৪৬]
- ৪৩) 'লোহার টুপি ওদের মগজ খেয়েছে'- ব্যাখ্যা কর। [ব. বো ' ১৭]
- ৪৪) বুধা চাচির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে কেন? [সি. বো. ৪৭]

সৃজনশীল প্রশ্ন

(১) পাকসেনারা থানায় ঘাটি স্থাপন করলে এলাকার মানুষের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করে। সবাই পালাতে শুরু করলে কলিমদ্দি দফাদার ভিন্ন পরিকল্পনা করেন। তিনি পাকসেনাদের ঘায়েল করার জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। আর গোপনে সব খবর পৌঁছে দেন, প্রস্তুত থাকতে বলেন। একদিন সুযোগমতো পাক সেনাদের গ্রামে এনে ভাঙা পুলের গোড়ায় দাঁড় করিয়ে কলিমদ্দি দফাদার তা পার হতে গিয়ে পরিকল্পনামাফিক জলে পড়ে যান। সাথে সাথে গর্জে ওঠে ওং পেতে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র। আর খতম হয় সব কজন পাকসেনা।

ক. বুধা প্রায়ই কী সাজত ?

খ. আধা-পোড়া বাজারটার দিকে তাকিয়ে ওর চোখ লাল হতে থাকে। কেন ?

গ. উদ্দীপকের কলিমদ্দি দফাদারের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সমগ্র ভাবকে ধারণ করে কি ? যুক্তিসহ প্রমাণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন

(২) ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে গর্জে ওঠে কলেজপড়ুয়া আবু সাঈদ। ঝাপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। তাঁর নেতৃত্বে একের পর এক গেরিলা আক্রমণে অতিষ্ঠ পাকসেনারা। অপারেশন জ্যাকপটের সফল অভিযানের পর পাকসেনারা আবু সাঈদের গ্রামে আক্রমণ করে। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। আর যাকে যেখানে পেয়েছে সেখানেই নির্মমভাবে হত্যা করে। একসময় আবু সাঈদ জানতে পারে স্বজন হারানোর খবর। কিন্তু সে আপসহীন। তার একটাই প্রতিজ্ঞা, এ দেশের মাটি থেকে ওদের তাড়াতেই হবে।

ক. কে বুধাকে 'মানিকরতন' বলে ডাকত ?

খ. এবার মৃত্যুর উৎপাত শুরু করেছে ভিন্ন রকমের মানুষ। এ কথা বলার কারণ কী ?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কাহিনী 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত করে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'উদ্দীপকের আবু সাঈদ-এর মনোভাবই যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মূল বক্তব্য যুক্তিসহ প্রমাণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন

(৩) জমিদার মফিজ খাঁর নাম শুনলে প্রজারা ভয়ে কাঁপতে থাকে। তার ভুকুমের অবাধ্য হলে সে প্রজার আর রক্ষা নেই। ইদানীং তার চেলা হিসেবে কাজ করছে, হাসেম ব্যাপারি। সারাক্ষণ তাকে কুপরামর্শ দেয় আর নানা অজুহাতে প্রজাদের হালের বলদ, ঘরের টিন, পুকুরের মাছ ধরে নিয়ে আসে। কেউ প্রতিবাদ করলে তাকে গ্রাম ছাড়া করে। গ্রামের সালিস-বিচার সবই হাসেম ব্যাপারির ইঙ্গিতে চলে। তাই সাধারণ মানুষ কানাঘুষা করে হাসেম ব্যাপারি যেন জমিদারের জমিদার।

ক. শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিল ?

খ. যে মানুষের দৃষ্টিতে ভাষা নেই, বুধার মতে সে মানুষ কেন মানুষ নয় ?

গ. উদ্দীপকের হাসেম ব্যাপারির সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বর্ণিত আহাদ মুন্নি চরিত্রের সাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দিকটিই 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের একমাত্র দিক নয়- যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ।

